ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

ক্বাদেরিয়া তরিকার দর্শন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Dhaka University Library
448596

তত্ত্বাবধায়ক -

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান

সহযোগী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448596

রচনা ও উপস্থাপনায়

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর : ৫২, শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্বাদেরিয়া তরিকার দর্শন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

44859৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

তারিখ : ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রি.

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	৪
ঘোষণা পত্র	৫
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	৬-৮
প্রথম অধ্যায় :	৯
ভূমিকা	১০-১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	২০
ইসলামে তরিকা : প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা	২১-৫৯
তৃতীয় অধ্যায় :	৬০
আবদুল কাদের জিলানি : জীবন ও কারামত	৬১-১৪১
চতুর্থ অধ্যায় :	১৪২
ক্বাদেরিয়া তরিকা : উৎপত্তি, প্রসার ও পালন-পদ্ধতি	১৪৩-১৫৭
পঞ্চম অধ্যায় :	১৫৮
উপসংহার	১৫৯-১৬৪
গ্রন্থপঞ্জী :	১৬৫-১৬৭

448596

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক মুহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক **'ক্বাদেরিয়া তরিকার দর্শন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'** শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটি মুহাম্মদ নুরুল আমিন-এর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

২৭.১২.০৯
(ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ঘোষণা পত্র

আমি **মুহাম্মদ নুরুল আমিন**, এম. ফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার **'ক্বাদেরিয়া তরিকার দর্শন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'** শিরোনামে এম. ফিল অভিসন্দর্ভের এই গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম গবেষণা কর্মও নয়, বরং আমার মৌলিক ও একক পরিশ্রম লব্ধ গবেষণা।

২৭/১২/২০০৯ ই

(মুহাম্মদ নুরুল আমিন)
এম. ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখ-কুটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিয়েছেন এবং উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে রচিত এই অভিসন্দর্ভ লেখার সামর্থ দান করেছেন। তাঁর তাওফিক ব্যতিত এই থিসিস রচনা বাস্তবিকই অসম্ভব হতো।

অসংখ্য দুরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির মহান দূত, বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (স.) এর প্রতি। যাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাঁর আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও জানাই অসংখ্য দুরুদ ও সালাম।

পরম শ্রদ্ধাভাজন মাতা-পিতার প্রতি অসংখ্য শুকরিয়া প্রকাশ করি, যাঁরা আমাকে প্রতিপালনের কষ্টসাধ্য কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও ভালবাসার মাধ্যমে যথার্থভাবে পালন করেছেন। সার্বক্ষণিক তাঁদের পরিত্র সান্নিধ্য ও পরামর্শ আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের প্রতি, যাঁর সুযোগ্য দিক-নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। স্যারের সার্বিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও আন্তরিক তত্ত্বাবধান আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে চিরঋণী করেছে। আমার শিক্ষাজীবনের পরম পুজনীয় স্যারের তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনে যাঁদের সান্নিধ্যে থেকে অধ্যয়ন করে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা-মননের পরিধি বাড়িয়েছি; তাঁদের মধ্যে মরহুম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার, মরহুম প্রফেসর ড. উম্মে সালমা, জনাব আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ড. আব্দুস সবুর খানসহ সকল সম্মানিত শিক্ষকের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও আমার প্রিয় ভাই জনাব মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন-এর নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার এ গবেষণার তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ ও সার্বিকভাবে আমাকে প্রেরণাদানের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক ভূমিকা কোনদিন ভুলতে পারব না।

আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোহাম্মদ নুরুল হক-এর নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক পথ-নির্দেশনা ও পরামর্শ আমাকে এ উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে বহুলাংশে অনুপ্রাণীত করেছে। আমার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমার বিশ্বাস, এ গবেষণাকর্মটি তাঁর জন্যেও সুখকর বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

আমার সহধর্মিনী শামীমা সুলতানা লাকী-এর নিকট আমি ঋণী থেকে গেলাম। আমাকে গবেষণাকর্মে যতটুকু উৎসাহ যোগানোর কথা তাঁর কাছ থেকে সবটুকুই আমি পেয়েছি। গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে তাঁর সহযোগিতা সত্যিই আমার মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। আর এটিও সত্য যে, আমার এ গবেষণাকর্মের মাঝে সে তাঁর অনেক অপ্রাপ্তিকে সার্থক প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নিবে।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরী ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার

লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশ ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত আধ্যাত্মিকতার সাথে সুপরিচিত এক অনন্য মুসলিম দেশ। কোন নবী কিংবা রাসুল নন, এদেশে ইসলামের আগমন হয়েছে মহান আউলিয়ায়ে কেরামের পুত:পবিত্র হাত ধরে। বাবা আদম শহীদ (র.) থেকে শুরু করে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনি, হযরত শাহ পরান (র.), হযরত শাহ মাখদুম (র.), হযরত শাহ আলি (র.), সুলতানুল আউলিয়া বায়েযিদ বাসতামি (র.), হযরত খান জাহান আলি (র.), হাজি মোহাম্মদ শরিয়তুল্লাহ (র.), মগুরিখোলার হযরত কেবলা শাহ আহসানউল্লাহ (র.) প্রমূখের নাম জানেনা বা এঁদের মাযারের সাথে পরিচিত নয়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে অতি নগন্য। মুলতঃ এঁরাই ছিলেন এদেশে ইসলাম প্রচারের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যাঁরা মূলত সবাই শান্তির ধর্ম ইসলামের আধ্যাত্মিকতার রসে সিক্ত ছিলেন এবং তাঁদের সবাই কোন না কোন তরিকা তথা বাস্তব জীবনে ইসলাম পালনের বিশেষ কোন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইসলামে অনেক তরিকার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটলেও আমাদের এতদাঞ্চলে মূলতঃ চারটি তরিকাই বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে এ তরিকাসমূহের প্রচার, প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটেছে। এখানে মূখ্য তরিকাগুলো হলোঃ

১. ক্বাদেরিয়া তরিকা

২. চিশতিয়া তরিকা

৩. নকশবন্দিয়া তরিকা ও

৪. মুজাদ্দেদিয়া তরিকা।

আমাদের পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বঙ্গীয় অঞ্চলে ও আজকের বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এসব তরিকাসমূহের মধ্যে ক্বাদেরিয়া তরিকা মূলতঃ বড়পির গাউসুল আযম হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (র.) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। আর চিশতিয়া তরিকা সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি (র.), নকশবন্দিয়া তরিকা হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকা মহান সংস্কারক হযরত শেখ আহমদ সারহিন্দ মোজাদ্দেদে আলফেসানি (র.) এর সাথে সম্পৃক্ত। এ চারটি তরীকাই মূলতঃ ইসলামে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার সাধনায় মূখ্য ভূমিকা পালনকারী স্বীকৃত তরিকা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে এ চারটি তরিকাই স্বমহিমায় উদ্ভাসিত রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যেও যে দুটি তরিকা এ উপমহাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে ও গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে, সে দুটি তরিকা হল, ক্বাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা। আর একারণেই এ দুটি তরিকাই এতদাঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রসারিত এবং জনপ্রিয় তরিকা হিসেবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানের কাছে পালনীয় হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আবহমান কাল থেকেই পির-মুরিদির ধারনাটি অত্যন্ত প্রবলভাবে পরিচিত একটি বিষয়। এ কারণে তরিকা চর্চার বিষয়টি এ দেশে ইসলাম প্রবেশের প্রভাতকালীন সময়ের সাথেই সম্পৃক্ত বলে গবেষক ও চিন্তাবিদগণ মনে করেন। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে পির-মাশায়েখ, অলি-কুতুবদের মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে এবং এর প্রচার ও প্রসার হয়েছে। তাই মানুষ ইসলাম গ্রহনের সাথে সাথে কোন না কোন তরিকার অনুসারী হয়েছে সেই ইসলাম আগমনকালীন সময় থেকেই। ইসলাম গ্রহনের সাথে সাথেই তাঁরা প্রত্যেকেই মুবাল্লিগ মাশায়েখদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছেই তারা ইসলামের মূলনীতি, ইবাদত-বন্দেগি এবং একই সাথে আধ্যাত্মিকতার সাধনা

ও এ বিষয়ের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ পির-মাশায়েখদের সাথেই সারা জীবন কাটিয়েছেন এবং তারাও পবিত্র ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে সফল হয়েছিলেন। পির ও আধ্যাত্মিক সাধকদের ইন্তেকালের পর তাঁদেরই কেউ কেউ পিরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা গদ্দিনশিন হয়েছেন। যা খেলাফত নামেই অধিক পরিচিত। কেউ কেউ স্বীয় পির বা মুর্শেদের প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালবাসার চরম নিদর্শন স্বরূপ তাঁর কবর বা মাযারের সাথে বাকী জীবন সম্পৃক্ত থেকে নিজেকে পির বা মুর্শেদের খাদেম বা ভৃত্য পরিচয় দিতেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। আর এভাবেই এ দেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মাযার বা খানকা কেন্দ্রীক আধ্যাত্মিকতা সাধনার চর্চা শুরু হয় এবং বর্তমান সময়েও তা স্বমহিমায় বিদ্যমান রয়েছে। আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এসব আচার ও রেওয়াজের প্রেক্ষিতে এদেশে ইসলামি তাসাউফ চর্চায় তা এক বিশাল ও অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

ক্বাদেরিয়া তরিকা এদেশ তথা উপমহাদেশে সর্বাধিক পরিচিত ও প্রসারিত তরিকাদ্বয়ের অন্যতম একটি। এ তরিকার উদ্ভাবক অলিকুল শিরোমনি গাউসুল আযম বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা এবং পির-মাশায়েখদের নিকট গ্রহণযোগ্যতাই তাঁকে পিরের আসনে সমাসীন করেছে। মাতৃগর্ভ থেকে শত্রুবধ করে মায়ের ইজ্জত রক্ষা, মাতৃগর্ভ থেকে আঠার পারা কুরআন হেফয করন, জন্মের মূহুর্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পালন, শিক্ষার্জনের জন্য বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসায় গমণ ও পথে ডাকাত দলের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্যবাদীতার পরিচয় দেয়া, পরিনামে দস্যু দলের সুপথে ফিরে আসা-এ কাহিনী আজো কিংবদন্তির মতো এদেশে মানুষের ঘরে ঘরে স্মরণীয় ও শিক্ষনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আর তাই প্রাচীন কাল থেকেই হযরত আবদুল কাদের জিলানির প্রতি

এদেশের মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক বিশেষ স্থান তৈরী হয়ে আছে। সেজন্যই এতদাঞ্চলের শতভাগ মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয়।

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে শতভাগ মানুষ তরিকা পালন তথা কোন বিশেষ তরিকার সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও এমন এক সময় ছিল যখন এদেশের মুসলমানদের প্রায় সবাই কোন না কোন তরিকা অনুসরণ করে চলতেন, যাদের সিংহ ভাগই ছিলেন ক্বাদেরিয়া তরিকা পন্থী। এমনকি ক্বাদেরিয়া তরিকা পন্থী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে তা সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করতেন। বর্তমান সময়েও জরিপ করলে যে ফলাফল বেরিয়ে আসবে তা হলো এদেশের অধিকাংশ মানুষ যারা তরিকত পন্থী, তাঁদের সিংহ ভাগই ক্বাদেরিয়া তরিকার অনুসরণ করেন এবং বড়পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) কে অত্যন্ত সম্মানের আসনে অলংকৃত করেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জীবন প্রবাহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কর্মানুষ্ঠান পরিচালনা, বিকাশ ও প্রতিপালন করে থাকে। সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

১. দৈহিক গতিধারা

২. রুহানি গতিধারা।

দৈহিক গতিধারাটি সাধারণতঃ জৈবিক চাহিদা, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আলো-বাতাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পচালিত হয়। পক্ষান্তরে রুহানি গতিধারাটি কেবল পরম স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সেতু বন্ধনের নিমিত্তে যাবতীয় ইবাদত, যিকির-আযকার, তাসবিহ-তাহলিল, মোরাকাবা-মোশাহাদা এবং সর্বোপরি ইশ্‌ক বা ঐশ্বরিক প্রেম-মহব্বতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে চালিত। হযরত আবদুল কাদের জিলানির বড় সার্থকতা এখানেই যে, তিনি এতদুভয়ের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরী করে সবার জন্য পালন উপযোগী একটি রীতি-পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। আর তারই বাস্তব প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে

উঠে তাঁর উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত তরিকা 'ক্বাদেরিয়া তরিকা'-তে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁর এ তরিকা প্রকৃত হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করে থাকে। তাঁর প্রণীত ক্বাদেরিয়া তরিকার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হলোঃ

১. পার্থিব বিষয়াদিতে সর্বোতভাবে মন না দিয়ে সৃষ্টির সেবা তথা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ও সার্বিক মানবতাবাদী কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করা।

২. শায়খের কাছ থেকে মুরিদের খিরকা গ্রহণের অর্থ হলো মুরিদের ইচ্ছা শায়খের ইচ্ছার অধীন করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খিরকা গ্রহণকারীও অন্যকে খিরকা প্রদান করতে পারবে, তবে এ খিরকা ধারণ অপরিহার্য নয়, বরং শায়খের প্রতি মুরিদের ব্যক্তিগত ভক্তিই যথেষ্ট। অবশ্য শায়খেরও কর্তব্য হচ্ছে, মুরিদের প্রয়োজন অনুযায়ী তরিকা ঠিক করে দেয়া।

৩. ক্বাদেরিয়া তরিকা কেবলমাত্র হাম্বলি মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

৪. ক্বাদেরিয়া তরিকাটি কেবল একজন কুতুবেরই অধীনে আর তিনি হলেন, কুতুবদের কুতুব হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)।

৫. ক্বাদেরিয়া তরিকার কোন কোন যিকির আল-কুরআনের মহান বাণীর সমবায়ে গঠিত। তাই এতে রক্ষণশীলতার অবকাশ রয়েছে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ভাবে যিকির করারই অনুমতি রয়েছে, তবে এ তরিকায় ধর্মীয় সঙ্গীত তথা সামা গ্রহণযোগ্য নয়।

মানবতার উৎকর্ষ সাধন, সভ্যতার বিকাশ আর সৃষ্টজীবের সার্বিক কল্যাণের সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য যুগে যুগে এই ধরাপৃষ্ঠে বহু সংখ্যক জ্ঞানী-গুনী, সাধক-তাপস, পণ্ডিত-চিন্তাবিদ, দার্শনিক-সুফি, পির-শায়খ, নবি-রাসুলসহ অন্যান্য শ্রেণী-পেশার মনীষিগণ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা স্বীয় স্বার্থ-লোভ আর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে

সামগ্রিকভাবে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। কিভাবে মানুষ পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতে পারবে, শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষ তাঁর এই শ্রেষ্টত্ব কিভাবে বজায় রাখতে পরাবে, কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে জীবনাতিবাহিত করলে পরম স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার বিনিময়ে ইহকালীন ও পারলৌকিক মুক্তি, কল্যাণ আর নাযাতের পথ প্রসারিত হবে-এসব ভাবনাই ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত। ইসলামি জগতেতো বটেই, বরং গোটা পৃথিবীর মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গকারী এসব নন্দিত মনীষিদের মধ্যে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) স্বীয় অনন্য সাধারণ প্রতিভা, যোগ্যতা, সাধনা, কারামত আর কীর্তির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে শীর্ষতম অবস্থানে স্বর্ণোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। শান্তি, উদার আর মানবতার ধর্ম ইসলাম তিনি নিজে শুধু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তাই নয়; বরং ইসলামের এই সার্বজনীন রাজপথে সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে, অবাধে বিচরণ করতে পারেন সেজন্য এক সহজ-সাধ্য ও উপযোগী পালন-পদ্ধতি তথা একটি যুগান্তকারী তরিকাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেই মোতাবেক আমল করলে, জীবন পরিচালনা করলে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে মানবজীবন সার্থক ও ধন্য হবে, মানুষ তাঁর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে এবং জাগতিক-পারলৌকিক সকল প্রকারের ফায়দা ও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা সেই বিশ্বখ্যাত মনীষি শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) মানুষ ও মানবতা এবং ইসলামের জন্য যেই ভুমিকা পালন করে গেছেন ও সার্বিকভাবে মানুষকে পরিশুদ্ধ জীবন-যাপনে যেই অসামান্য অবদান রেখেছেন-সে বিষয়টিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আর একই সাথে তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি ক্বাদেরিয়া তরিকা, এর উৎপত্তি, প্রেক্ষিত, উপযোগীতা, গ্রহণযোগ্যতা, প্রচার-প্রসার, অবস্থান, স্বীকৃতি এবং এ তরিকার গতি-পদ্ধতি, দর্শন ও পালনের নিয়মাবলী সবিস্তারে বিবৃত করার প্রয়াস পেয়েছি।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা' শিরোনামে রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইসলামে তরিকা : প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা', তৃতীয় অধ্যায় 'আবদুল কাদের জিলানি (র.) : জীবন ও কারামত', চতুর্থ অধ্যায় 'ক্বাদেরিয়া তরিকা : উৎপত্তি, প্রসার ও পালন-পদ্ধতি' এবং সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়টি 'উপসংহার' শিরোনামে রচিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যসূত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সবশেষে শুধুমাত্র যেসব গ্রন্থাবলীর সহযোগীতা নেয়া হয়েছে তার একটি তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জী' শিরোনামে প্রদত্ত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শুরুতে 'প্রত্যয়ন পত্র' ও 'ঘোষণাপত্র' সংযোজন করা হয়েছে এবং সূচিপত্রের পরই 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' শিরোনামে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মুসলিম ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে আমি শৈশব থেকেই একটি পারিবারিক ধর্মীয় আবহে লালিত-পালিত হয়েছি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলেম ও পির হবার কারণে অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মাহফিল, দোয়া-দুরুদ, তাসবিহ-তাহলিল আর বিভিন্ন অযিফা পালনের সাথে ছোটবেলা থেকেই আমি সম্পৃক্ত হয়ে আছি। প্রায়ই দেখে আসছি বাবার কাছে ধর্মভীরু ও পরহেযগার লোকজনের যাতায়াত এবং সাক্ষী হয়ে আছি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শনের আবেগঘন মুহূর্তগুলোর। পির-আউলিয়া, গাউস-কুতুব ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের আলোচনা শুনেছি বার বার। বাবার মুখঃনিসৃত সাধক-তাপস ও অলিদের ব্যাপারে জীবন ঘনিষ্ট আলোচনা শুনে আমি ইসলামের কীর্তিমান সাধক-সুফি মনীষিগণের ভক্ত হয়ে পড়ি। আগ্রহ বেড়ে যায় তাঁদের ব্যাপারে আরো জানার, বোঝার ও চিন্তা-গবেষণা করার। বিশেষ করে আমাদের দেশে বড়পির খ্যাত বিশ্বনন্দিত শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর ব্যাপারে আমি সর্বাধিক কৌতুহলী হয়ে পড়ি। ধর্মপ্রাণ আপামর মুসলিম জনগণের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও বড়পির (র.) এর প্রতি তাদের সীমাহীন ভালবাসা,

উচ্ছ্বাস ও ভক্তি-শ্রদ্ধা উপলব্ধি করে তাদের চিন্তার খোরাক ও চাহিদা পরিপূরণের জন্যই আমি উচ্চতর এ গবেষণায় মনীষি হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) কে বেছে নেই।

উপরন্তু, আমার এম. ফিল গবেষণাকর্মের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক, সম্মানিত শিক্ষক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের পরামর্শ, সার্বিক তত্ত্বাবধান আর যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা আমাকে অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনে সবচাইতে বেশী আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণার নিমিত্তে বর্তমান শিরোনামটি বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তাঁর সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে। ছাত্রজীবনের প্রতিটি ধাপেই আমার এ মহান শিক্ষকের পৃষ্টপোষকতা, পথ-নির্দেশনা আর অবদানের নিকট আমি চির ঋনী হয়ে থাকলাম।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় 'ভূমিকা'-তে আমি আমার গবেষণার প্রেক্ষাপট, বিষয় নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহ-কৌতুহলের কারণ এবং এ গবেষণায় অবলম্বনকৃত আমার রীতি-পদ্ধতির বিষয়ে আলোকপাত করেছি। থিসিসের দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইসলামে তরিকা : প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে অন্যতম বৃহৎ এই অধ্যায়ে আমি 'ইসলাম' কি, ইসলামের পরিচয়, এর সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের যথার্থ উপলব্ধি, ইসলামের দৃষ্টিতে তরিকার পরিচিতি, তরিকার সংজ্ঞা, তরিকতের উৎপত্তি, এর বিকাশমান ক্রমধারা, মানব সমাজে তরিকার চাহিদা ও উপযোগীতা, তরিকা সৃষ্টির পেছনে কারণ ও এর প্রেক্ষিত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালনীয় ও সমাদৃত তরিকাসমূহের পরিচিতি, বিবরণ ও মূল্যায়ন, তরিকা প্রবর্তকগণের অবদান, গুরুত্ব ও স্বীকৃতি, জীবন্ত ও প্রচলিত তরিকাসমূহের এমনকি অবলুপ্ত তরিকাগুলোরও অবদান ও মূল্যায়ন, ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে শ্রেষ্ট তরিকাসমূহের উপযোগীতা ও অবদান-ইত্যকার নানা বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি 'আবদুল কাদের জিলানি : জীবন ও কারামত' শিরোনামে রচিত সর্ববৃহৎ অধ্যায়। এতে মানবেতিহাসের শ্রেষ্টতম মনীষি, অলিকুল শিরোমণি, পৃথিবীর শ্রেষ্টতম পির ও বুযুর্গ, শায়খে আকবার, মহান সংস্কারক ও ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী মহাপুরুষ সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর বৈচিত্র্যময় ও প্রতিভাসম্পন্ন জীবন, অলৌকিকত্ব, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অনবদ্য অবদান, সুফিতাত্ত্বিক চেতনা, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত সংক্রান্ত রচনাবলী, সভ্যতার বিকাশে তাঁর ভূমিকা, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁর উপদেশাবলী ও বক্তৃতা, ওয়ায আর বাণীসমূহের বিশ্লেষণ, একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন, নানাবিধ আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী, যার সমাহারে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল কীর্তিময়-ইত্যকার নানা বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর শৈশবকালীন কৃতিত্ব, যুবক বয়সের নানা উপাখ্যান, স্বামী হিসেবে তাঁর বদান্যতা, সফল পারিবারিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা ও নিরলসভাবে জ্ঞান বিতরণ ও অধ্যাপনা, একজন সফল পিতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাঁর ভূমিকা-সর্বোপরি, একজন পরিপূর্ণরূপে সার্থক মানুষ হিসেবে বড়পির (র.) এর কীর্তিময় জীবনের নানা দিক পর্যালোচিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়টি 'ক্বাদেরিয়া তরিকা : উৎপত্তি, প্রসার ও পালন-পদ্ধতি' শিরোনামে রচিত হয়েছে। এতে মনীষি হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগদ্বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 'ক্বাদেরিয়া তরিকা'-এর উৎস, এর প্রচার-প্রসার, এ তরিকার বিকাশমান ক্রমধারা, এর পালন-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি, এ তরিকার অযিফা পালন ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজে এ তরিকার চাহিদা ও উপযোগীতা ইত্যাদী বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সর্বশেষ অধ্যায়ে 'উপসংহার' শিরোনামে সার্বিকভাবে আলোচ্য বিষয়ের উপর একটি অনুসিদ্ধান্ত টেনে যবনিকাপাত করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর-বন্দর-নগর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা পরহেযগার, মুমেন-মুত্তাকি ও ধর্মভীরু-খোদাপ্রেমিক আপামর জনসাধারণ-যারা অলি, সাধক ও কামেল সুফিগণের নাম শুনামাত্রই সীমাহীন ও অকৃত্রিম আবেগ-ভালবাসায়, শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বিগলিত হয়ে পড়েন এবং পির-মুর্শেদগণের খেদমতে নিজেদের আত্মনিয়োগ করাকে মহাপূণ্যের কাজ মনে করেন, তাঁদের জন্য আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি একটি মনের খোরাক হয়ে থাকবে। আমার এ গবেষণাকর্মটি সমভাবে তাঁদের জন্যও ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে, যারা নানাবিধ কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার কারণে পির-মূর্শেদ, গাউস-কুতুবগণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান নি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যয়নে তাঁরাও ইসলামের সত্য, সুন্দর, উদার, অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, বিশ্বভ্রাতৃত্বসম্পন্ন মানব কল্যাণধর্মী, সহিষ্ণু ও প্রেমময় ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করতে পারেন। আমার এ গবেষণাকর্ম যদি কারও কিঞ্চিৎ উপকারে আসে এবং এর মাধ্যমে দ্বিন ও ইসলামের সুফিতাত্ত্বিক ব্যাবস্থার প্রতি কৌতুহলবোধ জাগ্রত হয়, তবেই গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে তরিকা : প্রেক্ষিত ও অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে তরিকা : প্রেক্ষিত ও অবস্থান

মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন[১] বা জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। আল্লাহ পাক বলেন, 'ইন্নাদ-দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।'[২] অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'[৩] তিনি আরো বলেন, 'ওমাইয়াবতাগি গাইরাল ইসলামা দ্বীনান ফালাইয়ুক্বালা মিনহু ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন।'[৪] অর্থাৎ 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।'[৫] কেননা আল্লাহ তাআলা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি হিসেবে কেবলমাত্র ইসলামকেই মনোনীত ও পছন্দ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতেও আমরা সে বিষয়েরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আল্লাহ্ পাক বলেন, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।'[৬] অর্থাৎ 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীণকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[৭]

ইসলাম সালাম (সমর্পণ, আনুগত্য), সিল্‌ম (সন্ধি করা, মিলন, সমবেদনা), সালা'ম (শান্তি, প্রণিপাত, সংশোধন, দোষমুক্তি), সালা'মাত (মুক্তি, অভয়, নিরাপত্তা) এর যে কোন ধাতু হতে নির্গত বলা যায়। কারণ ইসলাম শব্দ উল্লিখিত প্রত্যেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুসলিম ইসলাম হতে নির্গত বিশেষণ; অর্থ ঃ সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা বা আত্মসমর্পনকারী। ইসলামের পারিভাষিক অর্থ হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্ম। যা স্বাভাবিক ও কল্যাণকর তা সিদ্ধ ও বরণীয় এবং যা অস্বাভাবিক ও অকল্যাণকর তা নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আকায়েদে দেখা যায়, খোদা এক, অতুলনীয় নিত্য চৈতন্যময়, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বগুণের আধার, যাবতীয় অপগুণ বিবর্জিত। নবিগণ অমানব বা অতিমানব নন, বরং তাঁরা নিস্পাপ মানুষ এবং সম্মানের পাত্র।

ইসলামের পারলৌকিক জীবন উন্নতি ও সংশোধন মূলক, সমাপ্তি বা ধ্বংস মূলক নয়। ইসলামের সত্যতার প্রমান তার নিজস্ব সৌন্দর্যে, কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। উপাসনা একমাত্র খোদার জন্য নির্দিষ্ট। তা দেহ, মন, প্রাণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সকলে সমানভাবে তাতে যোগ দিতে পারে, কোন পুরোহিত বা যাজকের আবশ্যক হয় না। এর যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা জ্ঞানানুমোদিত এবং ন্যায়, সাম্য ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত।[৮]

ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়তের জন্যে প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরিয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরিয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবি (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে কারিমে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে ‘মুসলিম’ এবং নিজ নিজ উম্মতকে ‘উম্মতে মুসলিমাহ’ বলেছেন- একথাও কুরআন পাক থেকেই প্রমাণিত। শেষ নবি (সা.) এর উম্মতকে বিশেষভাবে ‘মুসলিম’ বলাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত রয়েছে।[৯] মোটকথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১০] ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট

আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ.) বলেন, 'ওয়া উমিরতু আন আকুনা মিনাল মুসলিমিন।' অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। এ কারণেই হযরত ইবরাহিম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন।[১১] হযরত ঈসা (আ.) এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল, 'ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমুন।' অর্থাৎ সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। ফলকথা হলো, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে-মোহাম্মদিই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে–যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।[১২]

জীবনের সবকাজে আল্লাহর আনুগত্যই ইসলাম। মহানবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) নিজে তা কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি আদর্শ মুসলমান। তিনি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় কার্যই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করেছেন। তাঁকে যিনি যত বেশী অনুসরণ করতে পারবেন তিনি তত ভাল মুসলমান। নামায-রোযা ও যাবতীয় কর্মের ভেতর দিয়ে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণই ইসলাম। মনীষী কারলাইল বলেন,

> 'Islam means in its way denial of self, annihilation of self. This is yet the highest wisdom that heven has reveald to our earth.'

ইসলাম সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমত নয়। অন্যান্য নবি যে সব সত্য প্রচার করেছেন ইসলামে সে সমস্তই আছে। তদুপরি কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থাও তাতে রয়েছে। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সর্বধর্মের সমন্বয়। ভিন্ন ধর্মের লোক ইসলামে প্রবেশ করলে সে সাবেক ধর্মের সত্যগুলি তো পায়ই, অতিরিক্ত কতকগুলি সুবিধা সুযোগও সে প্রাপ্ত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্তই মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করে থাকে।[১৩]

কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত এই পাঁচটিকে আরকানে ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়। ঘর যেরূপ শুধু খুঁটি নয়, আরও অনেক জিনিষ সংযোগে হয়, সেইরূপ শুধু কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইসলাম নয়, আরও বহু জিনিষের সংযোগে ইসলাম হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল অনেকে শুধু এই পাঁচটি বিষয়কেই ইসলাম মনে করে থাকে। কেউ এইটুকু করতে পারলে তাকে পাক্কা মুসলমান মনে করা হয়, তার অন্য কার্যকলাপ যতই ইসলাম বিরোধী হোক না কেন। মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর কিছুটা গ্রহণ ও কিছুটা বর্জন করলে সুফল পাওয়ার আশা কম।[১৪]

অভিধানের দৃষ্টিতে ইসলাম অর্থ আদেশ পালন করে চলা। কিন্তু দ্বীনের ভাষায় যখন কথা বলা হয়, তখন এ শব্দের অর্থ শুধু সেই আদেশ পালন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করে চলা। অতএব মুসলিম তাকেই বলে যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর আদেশ লংঘন করে না।[১৫]

মানব অস্তিত্বের প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত শরিয়তের যেসব আহকাম চলে এসেছে তা সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এ জন্যে তার প্রতিটির আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। এর ভিত্তিতেই বলা যায় যে, প্রত্যেক যুগের শরিয়তের আহকামের যে সমষ্টি, যাকে দ্বীন বলে, তা ছিল ইসলাম। আর তা যারা মেনে চলেছে,

তাদের প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে ছিল মুসলিম। এ এমন এক অনিবার্য সত্য যে সম্পর্কে জ্ঞান ও বিবেক এবং কুরআনের সাক্ষ্য একমত। হযরত ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, ‘মা কানা ইবরাহিমা য়াহুদিইয়াও ওয়ালা নাসরানিয়্যাও ওয়ালাকিন কানা হানিফাম মুসলিমা।’[১৬] অর্থাৎ ইবরাহিম (আ.) না ছিলেন ইয়াহুদি, আর না ছিলেন নাসরানি (খৃষ্টান)। বরঞ্চ সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন তিনি। আর এক স্থানে হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর বংশধর হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.) প্রমুখ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘শুনো সে সময়ের কথা যখন ইবরাহিমকে তাঁর প্রভু বলেছিলেন–মুসলিম হও অর্থাৎ আমার অনুগত হয়ে যাও। তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি জগতসমূহের প্রভুর মুসলিম অর্থাৎ অনুগত হয়ে গেলাম। অতঃপর এ বিষয়ে অসিয়ত করলেন ইবরাহিম তার পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে এই বলে, হে আমার সন্তানগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই বিশেষ দ্বীনটি পছন্দ করেছেন। অতঃএব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়ে থেকো। তাঁরা বলল, আমরা আপনার ইলাহর বন্দেগি করব এবং আমরা তাঁরই মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকব।’[১৭] কুরআন পাকে এ ধরণের বিশ্লেষণ হযরত লুত (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবিগণের সম্পর্কেও দেয়া হয়েছে। অতঃপর সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই ছিলেন মুসলিম এবং সকলেরই দ্বীন ছিল ইসলাম।[১৮]

গোটা সৃষ্টিজগত সৃষ্টিগতভাবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিম এবং শরিয়তগতভাবে সব নবির উম্মতই মুসলিম ছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রত্যেক দ্বীনও ছিল ইসলাম। কিন্তু ইসলাম এবং মুসলিম শব্দদ্বয় যখন সাধারণভাবে বলা হয়, তখন শেষ নবির প্রচারিত দ্বীনকেই বলা হয় ইসলাম এবং তাঁর অনুসারী উম্মতকে বলা হয় মুসলিম।[১৯]

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ এবং শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শান্তি, আর এর ব্যাপক অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আত্মসমর্পণ করা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে যত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন তাঁরা সবাই ইসলামের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। রাসুল (সা.) আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত যে দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এনে দেন তা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। ইসলাম হচ্ছে আলো, এই আলো মানবতাকে শিরক, কুফর ও বিদআত-এর মত পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। এই আলো মানুষকে সত্য সুন্দর সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করে। ইসলাম দুনিয়ার কল্যাণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। একমাত্র সঠিক সত্য এ দ্বীন মানুষকে ন্যায় ও সত্য পথে পরিচালিত করে। কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে, ‘সত্য সমাগত মিথ্যা দূরীভূত, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। (১৭ ঃ ৮১)[২০]

মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবন ব্যবস্থা ইসলামের সোনালী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে পথহারা, বিভ্রান্ত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবগোষ্ঠীকে সঠিক, সত্য ও সুন্দরের রাজপথ দেখানোর জন্যে, অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত আদম সন্তানদেরকে হিদায়াতের আলোকজ্জ্বল পথের দিশা দেয়ার মহান লক্ষ্যে তাওহিদ, রেসালাত, আখেরাত ও ন্যায় এবং ইনসাফের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য মহাপুরুষ, যাঁদেরকে নবি ও রাসুল হিসেবে অভিহিত করা হয়। সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে নবুয়তের যে ধারা চালু হয় তারই যবনিকা ঘটান সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবি ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ পাক তাঁর নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ এই নবী-রাসুলগণের মাধ্যমেই দুনিয়াবাসীকে ইসলামের বিধি-বিধান,

নিয়ম-নীতি, আদেশ-নিষেধ, করনীয়-বর্জনীয়, আচার-পদ্ধতিসহ সকল নির্দেশাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। মানবজাতির ইতিহাসের ক্রমধারায় প্রায় প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের কাছেই মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত নবি-রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ওয়ালাক্বাদ বাআসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসুলা, আনি'বুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত্ তাগুত’ অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নিকট রাসুল পাঠিয়েছি, তাঁরা জনগণকে আল্লাহর ইবাদত ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেছেন। ধরাপৃষ্টে যুগে যুগে মানবজাতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, জীবনাচার ও সার্বিক দিকনির্দেশনা নবি-রাসুলগণের কাছ থেকেই লাভ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের নানা সময়ে আবির্ভূত এসব পুন্যবান মনীষীদের নবুয়তী মিশনের সর্বশেষ ঘন্টাটি বাজে বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের মধ্য দিয়ে। মানবজাতি পেয়ে যায় তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সুহৃদকে। মানবতার ইতিহাসের এক ভয়াবহ দুঃসময়ে, আইয়ামে জাহেলিয়া তথা অজ্ঞতা-অন্ধকার যুগে মরুভূমির আরবে আগমন করে অসভ্য, বর্বর, নিষ্ঠুর সমাজের মানুষগুলোকে সর্বযুগের শ্রেষ্টতম সুসভ্য, মানবতাবাদী ও অনুসরনীয় জাতিতে পরিণত করেছিলেন। মহানবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর তিরোধানের মাধ্যমেই নবুয়তি ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর নক্ষত্রতুল্য সাহাবিগণ তখন অনুসারীদের জন্য অনুকরনীয় হন। সাহাবিদের পর তাবেঈ এবং তারপর তাবে-তাবেঈদের যুগ শুরু হয়। মহানবি (সা.) এর ইন্তেকালের পর ইসলামি দুনিয়ার বিস্তৃতি ও প্রসারের সাথে সাথে তাঁর অনুসারীদের মাঝে রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে মতভেদ, দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের যেমন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও উদ্ভব হয় নানান তরিকা, মাযহাব ও সম্প্রদায়ের। এসব মত, পথ ও তরিকার উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুশাসনের পদ্ধতিগত বিষয়াবলী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের সঠিক প্রয়োগ থেকে বিচ্যুতিও ঘটেছে। তবে রাসুল (সা.) এর অবর্তমানে ইসলামি দুনিয়ার বিদগ্ধ

মনীষীগণ ধর্মচর্চার সহজ গতিপথ নির্ণয়ে যেসব তরিকার গোড়াপত্তন করেছেন তা মুসলিম মানব সমাজের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান মুসলমানদের কাছে সহজ-সরল ও পালন ক্ষেত্রে অধিকতর আগ্রহী করে তোলার জন্যেই মূলতঃ তরিকাসমূহের উৎপত্তি ঘটে। এভাবেই নবি-রাসুল পরবর্তী ইসলামি ব্যক্তিত্বদের চিন্তা, গবেষণা, দর্শন ও চেতনাসমৃদ্ধ তরিকাসমূহের সুদৃঢ় ভিত্তি মুসলিম দুনিয়ায় স্থাপিত হতে থাকে। আর সেগুলোর অধিকাংশই ইসলামের উদারতা, সংযম, সহমর্মিতা, মানবতাবাদ ও নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইসলামের একনিষ্ঠতা, বিনয়-নম্রতা, প্রেম ও সার্বজনীনতার প্রকৃত চিত্র তরিকা পালনের মাধ্যমে ফুটে উঠতে থাকে।

‘তরিকা’ এর শাব্দিক অর্থ পথ, পন্থা, পদ্ধতি (Method, Manner)।[২১] ‘তরিকত’ শব্দটি ‘তারিক’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। ‘তারিক’ শব্দের আভিধানিক অর্থ-জনপথ বা রাস্তা এবং ‘তরিকত’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ-পথচলার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়মাবলী, পদ্ধতি, প্রণালী, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, দিশা, দিশারী প্রভৃতি। পথচলার নির্দেশনা অনুযায়ী যেপথ ও মত অবলম্বন করে পরম প্রেমময় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন করা যায়, তাঁরই জ্যোতির্ময় সত্তায় সমাহিত হওয়া যায়, তাঁরই সন্দর্শন লাভ করা যায়, তাকেই তাসাউফ শাস্ত্রের পরিভাষায় তরিকত বা তরিকা বলা হয়।[২২]

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সুফির পথপরিক্রমণ বা পরিভ্রমণকে তরিকত বলে। ‘তরক’ ধাতু হতে ‘তরিকত’ শব্দের উদ্ভব। ‘তরক’ অর্থ পথ বা পথ চলা। শব্দের শেষে ‘তে’ হরফ থাকায় তা তাওহিদের ইশারা জ্ঞাপন করেছে। তাওহিদের পথে চলাকে এখানে তরিকত বলা হয়েছে। শরিয়ত অর্থ বিধি, বিধান, পথ এবং তরিকত অর্থ খোদায়ী বিধান বা পথ ধরে তাওহিদের দিকে অগ্রসর হওয়া। তরিকত সুফির কর্ম ক্রিয়া বা সাধনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদিসে উক্ত হয়েছে, ‘আত্তারিকাতো আফওয়ালিহি’ অর্থাৎ হযরত রাসুল (সা.) বলেছেন,

'আমি যা করেছি, তাই তরিকত।' রাসুল (সা.) এর কর্মকেই তাহলে ইসলামের তরিকতরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাসাউফে 'তরিকত' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাওহিদের পথে চলা, তাওহিদ সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা, প্রকৃত সত্যের সংজ্ঞা বা গুঢ়তম দর্শন বা জ্ঞান অর্জন এবং তাওহিদের সাথে একীভূত হয়ে আপনার সত্তা হারিয়ে পরম জাত পাকের সত্তায় উপনীত হওয়া এবং আপনার ও পরম জাতের পরিচয়, দর্শন ও হালক লাভ করা প্রভৃতি সবই তরিকতের আয়ত্ত্বাধীন। অর্থাৎ তরিকত, হাকিকত, মারিফাত ও ওয়াহদানিয়াতকে সম্মিলিতভাবে তরিকত ধরা হয়। মোটকথা, তরিকত, হাকিকত, মারিফাত ও ওয়াহদানিয়াত ইসলামের মরমি দিকের নির্দেশক, যার ভিত্তিমূল শরিয়ত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুরা মায়েদা-তে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য একটি জীবন বিধান বা শরিয়ত ও অন্যটি খাসপথ বা মিনহাজ প্রদান করেছি। মিনহাজ শব্দটিই তরিকত সম্পর্কিত বিশেষ পথ বা পথ পরিভ্রমণের নির্দেশক। মিনহাজ শব্দটি তরিকত, হাকিকত, মারিফাত ও ওয়াহদানিয়াতের সম্মিলিত রূপ।[২৩]

তরিকত জাতীয় পথ নির্দেশনায় নবি-রাসুলগণ নিয়োজিত ছিলেন। নবি-রাসুলদের উপর থেকে এই দায়িত্বভার ফুরিয়ে যাওয়ার পর সর্বকালের সর্বমানবের জন্য সর্বশেষ দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হলেন আমাদের সর্বশেষ-সর্বশ্রেষ্ট বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)। পারলৌকিক পরিত্রাণ বা মানবাত্মার মুক্তি নির্দেশনা নিয়েই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানবকূলে। তাঁর মহাপ্রয়াণ বা তিরোধানের পূর্বে তিনি এই তরিকতের দায়িত্বভার অর্পণ করে যান হযরত আলির (রা.) উপর। যেহেতু রাসুল (সা.) হযরত আলি (রা.) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলি উহার প্রবেশদ্বার।' হযরত আলি (রা.) রাসুল (সা.) এর অনুমতিক্রমে তরিকতের তিনটি মৌলিক ধারায় তিনজনকে তিন রকম খেলাফত দান করে যান। যেমন,

১. তরিকায়ে আবরারে মুজাহেদিনের নেতৃত্ব দান করে যান তদীয় পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.)-কে।

২. তরিকায়ে আখিয়ারে সালেহিনের খেলাফত অর্পণ করে যান হযরত হাসান বসরি (র.)-কে।

৩. তরিকায়ে হুব্বুর রাসুল বা তরিকায়ে শুহাদায়ে আশেকিনের বেলায়েত দান করে যান হযরত ওয়াইস কারনি (র.)-কে।

তরিকতের এই তিনটি মৌলিক ধারা থেকেই আজকের মুসলিম বিশ্বে হাযার হাযার তরিকা ও উপ-তরিকার সৃষ্টি হয়েছে। এই একই তরিকা থেকে বিভিন্ন ধারা, উপধারা, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে আজকের তরিকাসমূহ। সম্ভবতঃ খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন ধারার তরিকাগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু তরিকা আজ অবলুপ্তও হয়ে গেছে। প্রাচীন তরিকাগুলোর মধ্যে হযরত আলি (রা.) থেকে উদ্ভূত ও অনুসৃত তরিকায়ে ক্বাদেরিয়া ও চিশতিয়া, হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) থেকে উদ্ভুত তরিকায়ে নকশবন্দিয়া এবং হযরত ওয়াইস কারনি (র.) থেকে উদ্ভূত ওয়াইসিয়া তরিকাগুলো আজও প্রচলিত আছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় তরিকাসমূহের মধ্যে হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানি কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং তাঁরই নাম অনুসারে প্রচারিত ক্বাদেরিয়া তরিকা, হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরির নাম অনুসারে চিশতিয়া তরিকা, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ কর্তৃক প্রচারিত নকশবন্দিয়া তরিকা এবং হযরত আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দেদ আলফে সানি কর্তৃক উদ্ভাবিত মুজাদ্দেদিয়া তরিকাগুলো বহুল প্রচারিত, জনপ্রিয়, সমধিক প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত।[২৪]

তরিকত সুফি সাধনার দ্বিতীয় স্তর। তরিকত আলমে মালাকুতের অন্তর্গত। এ স্তরে সাধককে বিশেষ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। বাহ্যিকভাবে শরিয়তে ইবাদতের বিধানসমূহ

অনুশীলন করার পর তা বিশেষ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা সুসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয় তরিকতের মাধ্যমে। এ আলোকে আলোকিত হবার জন্য উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন কলব বা আত্মার দরকার। যেমন, হাদিসে রাসুল পাক (সা.) ইরশাদ করেন, 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহর এ গুণাবলীর শ্রেষ্ট প্রকাশ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ চরিত্র। তাই রাসুল আকরাম (সা.) এর আখলাক লাভ করার এক কঠোর মুজাহিদা বা সাধনা চলে সুফি জীবনের এ স্তরে। এ কঠোর সাধনা ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ গুরুই সুফি পরিভাষায় পির বা শায়েখ বা মুর্শেদ নামে পরিচিত। মুর্শেদ হলেন আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানব। মহানবি (সা.) এর যাহিরি ও বাতেনি বিদ্যার ওয়ারিশ হলেন পিরে কামেল বা মুর্শেদ। সেজন্য তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এ আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করতে হয়। মহান আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুল, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।' অর্থাৎ আল্লাহকে, রাসুল (সা.) কে ও তোমাদের উপর আদেশদাতাকে অনুসরণ করো। আদেশদাতা হিসেবে পিতা-মাতা, অভিভাবক, ইমাম, আলেম, পির ও রাষ্ট্রীয় প্রধানগণকে বুঝায়। অধিকাংশ তাফসিরকারক 'উলিল আমরি মিনকুম' এর তাফসির করেছেন সাধারণতঃ ইমাম, আলেম ও পির-মুর্শেদরূপে। পির একই সাথে তরিকার ইমাম, দুই বিদ্যার আলেম ও পির । তাই সুফিগণ পির-কে অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হতে প্রয়াস চালান। এজন্য মুর্শেদের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন, বিনাপ্রশ্নে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মুর্শেদের নির্দেশ অনুসরণ সুফির পক্ষে এ স্তরে একান্ত প্রয়োজন।[২৫]

মূলতঃ আধ্যাত্মিক জগতের জ্যোতির্ময় সত্তা আহমদ থেকেই মুহাম্মদের মাধ্যমে তরিকতের উদ্ভব বা সূচনাকাল শুরু হয়েছে। এই অর্থেই রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমি তখন থেকেই নবি, যখন আদম (আ.) এর দেহ পানি ও মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অর্থাৎ আদমের দেহ গঠন হবার বহু আগে থেকেই আমি নবি ছিলাম।' আল্লাহর রাসুল আরো বলেন, 'শরিয়ত আমার নির্দেশাবলী, তরিকত আমার জীবন অবস্থা, মারিফাত আমার রহস্যভেদ, হাকিকত আমার অবস্থানসমূহ। এ থেকেই আমরা বলতে পারি যে, রাসুল (সা.) এর গোপন আরাধনা থেকেই শুরু হয়েছে তরিকত। শরিয়তের প্রকাশ্য জীবন ব্যবস্থা দ্বারা যেমন ছিল তাঁর কর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনই তাঁর গোপন আরাধনার স্তরগুলো তরিকত, মারিফাত ও হাকিকত দ্বারা ছিল এক রহস্যাবৃত অবস্থায়। একদিকে যেমন ছিলেন তিনি শরিয়তের প্রতি আত্মসচেতন, তেমনই তিনি অপরদিকেও ছিলেন আল্লাহর প্রেমে সর্বক্ষণ নিমগ্ন। তিনি ঐশী প্রেমের অনুরাগে বা তাড়নায় সর্বক্ষণ আত্মবিভোর অবস্থায় থাকতেন। নির্জন রাতে ঐশী প্রেমের তাড়নায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বক্ষণই আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্টতম সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি নির্জন নিশীথ-রাতে অর্থাৎ নির্জন রজনীতর তিনি জেগে জেগে মসজিদে নবুবির একটি নির্ধারিত স্থানে বসে খোদাপাকের আরাধনা-উপাসনায় মশগুল থাকতেন। মসজিদে নবুবির বারান্দায় বসে খোদাপ্রেমিক আসহাবে সুফফাদেরকে তরিকতের রহস্যভেদ শিক্ষা দিতেন। আসহাবে সুফফা অর্থ রারান্দার অধিবাসী। যেহেতু তাঁরা নির্জন রাতে মসজিদে নবুবির বারান্দায় বসে রাসুল (সা.) এর নিকট তরিকতের উপর তালিম-তরবিয়াত লাভ করতেন। এ থেকেই তাঁদেরকে ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফফাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এই সময় একদিন হযরত আলী (রা.) খোদাপ্রাপ্তির পথ সম্পর্কে অর্থাৎ খোদা তায়ালার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর দিদার লাভের উপায় সম্পর্কে রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন।

রাসুল (সা.) তাঁকে অহি লাভের অপেক্ষায় থাকতে বললেন। সত্যি সত্যিই ঐ সময় একদিন হযরত জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে রাসুল (সা.) কে কালেমায়ে তাইয়েবাহ তিনবার শিক্ষা দিলেন। কালেমায়ে তাইয়েবাহর যাহেরি ও বাতেনি অর্থ এবং উহার গোপন রহস্য ও মর্মভেদ শিক্ষা দিলেন। অতঃপর রাসুল (সা.) হযরত আলী (রা.) কেও অনুরূপভাবে তা শিক্ষা দিলেন এবং কালেমায়ে তাইয়েবাহর মর্মভেদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই কালেমায়ে তাইয়েবাহর মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের যতসব রহস্যভেদ। একবার উহার প্রকাশ্য অর্থে; আরেকবার উহার আভ্যন্তরীণ অর্থে অবতীর্ণ হয়েছে। নক্তাহীন বার বর্ণের এই কালেমায়ে তাইয়েবাহর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টিজগতের সমুদয় রহস্যভেদ। এতে বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ নিহিত রয়েছে। এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরম জ্যোতির্ময় সত্তার রহস্যভেদ এই কালেমায়ে তাইয়েবাহর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। এই কালেমা দুইভাগে বিভক্ত। যেমন, 'লা ইলাহা' এই ভাগে রয়েছে নফি, ফানা, নযুল বা অবরোহ। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'ইল্লাল্লাহ', এতে আছে এসবাত, বাকা, উরুজ বা আরোহ। আল্লাহ পাকের বাণী, 'যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই আপনি আপনার প্রভুর সাধনায় লিপ্ত হবেন। আর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনঃসংযোগ স্থাপন করুন।' এই আয়াতে তাযকিয়ায়ে নাফস অর্থাৎ সুফি সাধনার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এতদিনকার ইসলাম প্রচারের অসহনীয় দুঃখ-কষ্টের বোঝা রাসুলের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ইসলাম প্রচারের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ হবার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। অথচ ইহাই কালেমায়ে তাইয়েবাহর আভ্যন্তরীণ অর্থ। আর এই অর্থেই মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় আরো বলেন, 'আর আমি খোদাবিশ্বাসীদের প্রতি কালেমায়ে তাকওয়া তথা আত্মশুদ্ধি লাভের বাক্যটি পাঠ করা অবধারিত করে দিলাম।' সুতরাং এই কালেমায়ে তাকওয়া বা কালেমায়ে তাইয়েবাহ দুই

অর্থে দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমবার অবতীর্ণ হয়েছে শরিয়তের প্রকাশ্য অর্থে আর দ্বিতীয়বার তরিকতের আভ্যন্তরীণ অর্থে। অর্থাৎ তরিকতের রহস্যভেদ ও মর্মার্থে উন্নীত হবার উপায়-উপকরণ হিসেবেই কালেমায়ে তাকওয়া দ্বিতীয়বার নাযিল হয়েছে। 'কালেমায়ে তাকওয়া' মানে সংযমী বাক্য। যে বাক্যে আত্মসংযম শিক্ষা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পাশবিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা রা কুপ্রবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ এই কালেমা-তে রয়েছে বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কালেমায়ে তাকওয়া' হিসেবে। অন্যদিকে এই কালেমা আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং আত্মার পবিত্রীকরণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয় বলেই এর অপর নামকরণ করা হয়েছে 'কালেমায়ে তাইয়েবাহ' বা পবিত্র বাক্য হিসেবে।

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) এর সময় থেকেই আসহাব সুফফাহ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে অদ্যাবধি তরিকতের শিক্ষা-দীক্ষা চলে আসছে। আর তা বিভিন্ন তরিকা ও উপতরিকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বার বর্ণের নক্তাবিহীন পবিত্র এই কালেমার আভ্যন্তরীণ তালিম স্বয়ং রাসুল (স.) তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও প্রিয়তম সহচর হযরত আলি (রা.) কে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীতে আমিরুল মুমেনিন হযরত আলি (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হযরত হাসান বসরি (র.) কে ইসলামের এই মহান তরিকতের সঠিক শিক্ষা ও খেলাফত দান করেন। আর এভাবেই পবিত্র এই কালেমার বাতেনি তালিম পর্যায়ক্রমিকভাবে গাউসুল আযম, বড়পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) পর্যন্ত এসে পৌছায়। এসময়কাল পর্যন্ত তরিকতের উপর লিপিবদ্ধরূপে কোন বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত ছিল না। কেবলমাত্র মৌখিকভাবেই এর শিক্ষা পর্যায়ক্রমিকভাবে চলে আসছিল। অতঃপর তরিকতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (র.) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর খাস শিষ্যদের মধ্যে গোপনভাবে বিতরণ করেন।

ইসলামের মহান পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (স.) কে সুফি-সাধকগণ প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পির বলে অভিহিত করেন এবং সকল প্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলেও মনে করেন। আর সেজন্যই অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত রাসুলে মাকবুল (স.) হতেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত সকল তরিকার উদ্ভব হয়েছে। এসব তরিকার বিভিন্ন পির-পরম্পরায় রাসুল (স.) এর জ্ঞান নগরীর তোরণ দ্বার আমিরুল মুমেনিন হযরত আলি (রা.) অথবা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) এর মাধ্যমে রাসুল (স.) পর্যন্ত যাবতীয় তরিকার সিলসিলা (শৃংখলা) পৌঁছেছে। বিভিন্ন তরিকার নিয়ম-কানুন এবং আধ্যাত্মিক সুলুক ও তালিম সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে। এর পূর্ব থেকে সুফিগণের আধ্যাত্মিক অনুশীলন মুখে মুখে চলে আসছিল। এ সময় আধ্যাত্মিক সাধনার সুবিখ্যাত কুতুব ও প্রোজ্জ্বল পির-মুর্শেদ ইতিহাসখ্যাত বিভিন্ন তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এসব সুফি পির স্বীয় প্রতিষ্ঠিত তরিকার ইমাম ও কুতুব হিসেবে পরিগণিত হন।

বস্তুতঃ তরিকার সংখ্যা অগণিত। কয়েকটি প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত তরিকার বিভিন্ন শাখা-উপশাখা এইসব অগণিত তরিকার উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছে। এটি বাস্তব সত্য যে, এসব উদ্ভূত তরিকার অনেকগুলোই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশেষে বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে প্রায় তিন শতাধিক তরিকার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। আমিরুল মুমেনিন হযরত আলি (রা.) হতে চিশতিয়া ও ক্বাদেরিয়া তরিকা, হযরত আবুবকর (রা.) হতে নকশবন্দিয়া তরিকা এবং তাবেয়ি শ্রেষ্ঠ হযরত ওয়ায়েস কারনি (র.) হতে ওয়ায়েসিয়া তরিকার প্রবাহমান ধারা এখনো বয়ে চলেছে। ইতিহাসের আদি তরিকা হিসেবে এই ক'টি গুরুত্বপূর্ণ তরিকা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

বিশ্বে এ পর্যন্ত ৩১৩ টি তরিকার সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রায় ১১০ টি তরিকা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে ১০/১২ টি তরিকা বিস্তার লাভ করেছে, এর মধ্যে ৪টি তরিকা প্রধান।

এগুলো হলো কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া, বাকী বেশির ভাগ তরিকাই উপরোক্ত তরিকা সমূহের শাখা-প্রশাখা বা সমন্বয়।[২৬]

ইসলামি সুফিদর্শনে চার পির বা চার তরিকা ও চৌদ্দ খান্দান প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তরিকার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার পির বা চার মুর্শেদ হচ্ছেন জগদ্বিখ্যাত চিশতিয়া তরিকার পির, ইমাম খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি (র.), ক্বাদেরিয়া তরিকার পির ও ইমাম, অলিকুল শিরোমণি হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানি (র.), নকশবন্দিয়া তরিকার পির ও ইমাম হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) এবং মুজাদ্দেদিয়া তরিকার পির ও ইমাম হযরত আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানি (র.)। অবশ্য কেউ কেউ সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার পির ও ইমাম হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (র.) কে হযরত মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানি (র.) এর পরিবর্তে চার পির বা চার ইমামের অন্যতম বলে গণ্য করেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে।

ইতিহাসে চৌদ্দ খান্দান বলতে চিশতিয়া তরিকার পাঁচটি শাখা ও ক্বাদেরিয়া তরিকার নয়টি শাখাকে বুঝায়। আর সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

চিশতিয়া তরিকার পাঁচটি শাখাঃ

১. হযরত খাজা আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (র.) থেকে যায়েদিয়া শাখা
২. হযরত ফুজাইল বিন আয়ায (র.) থেকে আয়াযিয়া শাখা
৩. হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম (র.) থেকে আদহামিয়া শাখা
৪. হযরত খাজা হিবরাতুল বসরি (র.) থেকে হিবরাবিয়া বা হিবারিয়া শাখা
৫. হযরত খাজা আবু ইসহাক চিশতি (র.) থেকে চিশতিয়া শাখা।

ক্বাদেরিয়া তরিকার নয়টি শাখাঃ

১. হযরত হাবিব আযমি (র.) থেকে হাবিবিয়া শাখা

২. হযরত খাজা বায়েজিদ বাস্তামি (র.) থেকে তারকুরিয়া বা তাইফুরিয়া শাখা

৩. হযরত মারুফ আল খারকি (র.) থেকে খারকিয়া শাখা

৪. হযরত সিররি আল সিকতি (র.) থেকে সিক্তিয়া শাখা

৫. হযরত ইবরাহিম আবু ইসহাক গাজরুনি (র.) থেকে গাজরদিনিয়া শাখা

৬. হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (র.) থেকে জুনায়েদিয়া শাখা

৭. হযরত আলাউদ্দিন তুরতুসি (র.) থেকে তুরতুসিয়া শাখা

৮. হযরত নাজমুদ্দিন আহমদ কারতু (র.) থেকে কারতুসিয়া শাখা

৯. হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (র.) থেকে সোহরাওয়ার্দিয়া শাখা।

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত প্রায় তিন শতাধিক সুফি তরিকার মধ্যে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া- এই চারটি জগদ্বিখ্যাত তরিকার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সর্বাধিক এবং এগুলোর প্রত্যেকটি তরিকাই ইসলামি জীবন ব্যবস্থা তথা শরিয়ত, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহ্‌র উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতিত অধিকাংশ তরিকাই হয় মূল ইসলামি শরিয়ত ও জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে পড়েছে নয়ত কালের গহ্বরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু তরিকা কোন প্রকারে তাদের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে এবং অন্য কোন কোন তরিকা বড় কোন প্রভাবশালী তরিকার সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে যেহেতু ক্বাদেরিয়া তরিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তাই নিম্নে ক্বাদেরিয়া তরিকা ব্যতীত অন্যান্য কিছু প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তরিকার পরিচিতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো।

চিশতিয়া তরিকা

চিশতিয়া তরিকার প্রধান পির ও ইমাম হলেন হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি (র.)। তিনি এই প্রসিদ্ধ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ কুতুবও বটে। কেউ কেউ অবশ্য হযরত

আবু ইসহাক (র.), হযরত বান্দা নওয়ায (র.) অথবা হযরত খাজা আহমাদ আবদাল (র.) কেও চিশতিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গরিবে নেওয়ায হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি (র.)-ই চিশতিয়া তরিকার মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ মহান পির ও মুর্শেদকে গরিবে নেওয়ায, গাওসে সামদানি, মুহিয়ে সুন্নাহ প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা হয়। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হতে হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি (র.) পর্যন্ত পিরানে পিরের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপঃ

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)
২. হযরত আলি (রা.)
৩. হযরত হাসান আল বসরি (র.)
৪. হযরত আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বসরি (র.)
৫. হযরত আবুল ফায়েয ফুজাইল বিন আয়ায আল মাদানি (র.)
৬. হযরত খাজা সুলতান ইবরাহিম বিন আদহাম বালখি (র.)
৭. হযরত খাজা হুযায়ফা আল মারাশি (র.)
৮. হযরত খাজা আমিনুদ্দিন আবু হুবায়রাতুল বসরি (র.)
৯. হযরত খাজা আবু ইবরাহিম ইসহাক মুমসাদ আলেবি (র.)
১০. হযরত খাজা আবু ইসহাক শামি আল আশায়ি চিশতি (র.)
১১. হযরত কুতুবুদ্দিন আবু আহমদ আবদাল ইবনে ফারেস্তা কাহ্ চিশতি (র.)
১২. হযরত খাজা নাসিরুল হক আবু মুহাম্মদ আবদাল ইবনে আবু আহমদ চিশতি (র.)
১৩. হযরত খাজা নাসিহুল হক আবু ইউসুফ চিশতি (র.)
১৪. হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন মওদুদ আল চিশতি আল আজমিরি (র.)
১৫. হযরত খাজা মখদুম হাজি শরিফ যিন্দানি আল বোখারি (র.)

১৬. হযরত খাজা ওসমান হারুনি খোরাসানি (র.)

১৭. হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি (র.)।

চিশতিয়া তরিকার অনুসারীগণের মতে, প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র শিক্ষা অনুযায়ী হযরত আলি (রা.) এর মাধ্যমে এর তালিম হযরত হাসান বসরি (র.) লাভ করেন এবং তা সিনায় সিনায় হযরত ওসমান হারুনি (র.) পর্যন্ত চলে আসে। এ পর্যন্ত এই পবিত্র তালিম সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে লিখিত ছিল না। হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি (র.) এই তালিম সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেন এবং তরিকার অন্যান্য নিয়ম-পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করেন।

সুপ্রসিদ্ধ চিশতিয়া তরিকা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, চীন, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশে বিস্তার লাভ করে এবং এখনো তা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এসমস্ত দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

নকশবন্দিয়া তরিকা

হযরত শায়খ খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ আল বোখারি (র.) হলেন সুপ্রসিদ্ধ নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন এই গুরুত্বপূর্ণ তরিকার প্রধান কুতুব ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম।

নকশবন্দিয়া তরিকার বিশেষত্ব হলো এই যে, অন্যান্য তরিকা শরিয়ত ও তরিকত উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে, পক্ষান্তরে নকশবন্দিয়া তরিকা তরিকতের চাইতে শরিয়তের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

নকশবন্দিয়া তরিকার ইমাম হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) ৭০৮ মতান্তরে ৭১৮ হিজরি সনে মধ্য এশিয়ার বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি স্বীয় পিতা হযরত মুহাম্মদ বোখারি (র.) এর সাথে বিভিন্ন নকশা খচিত কাপড় বয়ন করতেন। পরবর্তীতে পির

ও সাধকরূপে পরিগণিত হবার পর তিনি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন সেদিকেই 'আল্লাহ' নামের নকশা অঙ্কিত হয়ে যেত। আর সে কারণেই তিনি ইতিহাসে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকা 'নকশবন্দিয়া তরিকা' নামে খ্যাতি লাভ করে।

খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) পিতার ইন্তেকালের পর উচ্চতর শিক্ষালাভ ও সুফিতত্ত্বে দীক্ষা অর্জনের নিমিত্তে আঠার বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং সমকালীন খ্যাতিমান আলেম ও সাধক হযরত সৈয়দ খাজা আমির কালাল (র.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। স্বীয় মুর্শেদের ইন্তেকালের পূর্বে তিনি খেলাফত লাভ করেন। প্রিয়নবি (স.) থেকে খাজা বাহাউদ্দিন (র.) পর্যন্ত পিরানে পিরগণের নামের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপঃ

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)
২. হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)
৩. হযরত সালমান ফারসি (রা.)
৪. হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবুবকর (র.)
৫. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.)
৬. হযরত বায়েযিদ বাস্তামি (র.)
৭. হযরত ইমাম মুসা কাযেম (র.)
৮. হযরত ইমাম আলি রেযা (র.)
৯. হযরত মারুফ আল খারকি (র.)
১০. হযরত আবুল হোসে সিররি আল সিকতি (র.)
১১. হযরত জুনায়েদ আল বাগদাদি (র.)
১২. হযরত খাজা আবু আলি রোদবারি (র.)

১৩. হযরত আবুল কাসেম নাসিরাবাদি (র.)

১৪. হযরত আবুল কাসেম গোরগানি আল কোরায়শি (র.)

১৫. হযরত আবু আলা দাক্কাক (র.)

১৬. হযরত আবু আলি ফারমেদি (র.)

১৭. হযরত খাজা ইউসুফ জামদানি (র.)

১৮. হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানি (র.)

১৯. হযরত খাজা আরিফ রেওগড়ি (র.)

২০. হযরত খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনাবি (র.)

২১. হযরত শায়খ আলি রামেথানি (র.)

২২. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা শামমাসি (র.)

২৩. হযরত সৈয়দ শামসুদ্দিন আমির কালাল (র.)

২৪. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ আল বোখারি (র.)।

নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারীগণ মনে করেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) কে যে গুপ্ত ইল্‌ম বা জ্ঞানভাণ্ডার দান করেছিলেন তা এ গুরুত্বপূর্ণ তরিকার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়ে গেছে। এ তরিকার প্রধান তালিম হচ্ছে, ‘লাতায়েফে সিত্তাহ’ তথা ছয় লতিফা (যেমন, কাল্‌ব, রুহ্‌, সির, খফি, আখফা, নাফ্‌স) ও ‘আরবায়ে আনাসির’ (যেমন, অ’ব বা পানি, অ’তাশ বা আগুন, খ’ক বা মাটি, ব’দ বা বাতাস) এর ভিন্ন ভিন্ন মোরাকাবা। এছাড়া ‘হাযরাতুল খামসি’ (যেমন, সায়ের ইলাল্লাহ, সায়ের ফিল্লাহ, সায়ের আনিল্লাহ, আলমে মিসাল ও আলমে শাহাদত) এর মোরাকাবাও নকশবন্দিয়া তরিকার অন্যতম তালিম। মহান সাহাবি হযরত আবুবকর (রা.) মহানবি (স.) হতে এই গুপ্ত ও রহস্যাবৃত তালিম হাসিল করেছেন, যা নকশবন্দিয়া তরিকার সিলসিলায়

পির পরম্পরায় হযরত খাজা বাহাউদ্দিন (র.) পর্যন্ত এসে পৌঁছে। আর এই পর্যন্ত এ তালিম লিপিবদ্ধ ছিল না। এই পবিত্র তালিম এই পর্যন্ত মুখে মুখেই ও সিনায় সিনায় চলে এসেছে। পরিশেষে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) এই তালিমকে সুসংবদ্ধ, সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন।

নকশবন্দিয়া তরিকায় নিম্নলিখিত আটটি জিনিষের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। সেগুলো হলঃ

১. হুশদার দাম (শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি খেয়াল রাখা)
২. নাযার বার কাদাম (পিরের কদমের দিকে নযর করা)
৩. সাফার দার ওয়াত্ন (দেহের মধ্যে ভ্রমণ)
৪. খেল'ভাত দার আন্‌জুমান (চুপে চুপে আলাপ)
৫. ইয়াদ কারদ (স্মরণ বা যিক্‌র করা)
৬. ব'য কাস্ত (আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া)
৭. নেগ'দাস্ত (আল্লাহতে নিমজ্জিত হওয়া)
৮. ইয়াদ দাস্ত বা খুদ গোজাশ্‌ত (নিজেকে নাস্তি করে আল্লাহকে স্মরণ করা)।

নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ও সুফিগণ ইসলামি শরিয়তের নির্দেশাবলীর প্রতিই অধিকতর মনযোগ ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ওযিফা, মোরাকাবা ও যিক্‌রের মাধ্যমে পরম সত্ত্বা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মানসে আরাধনা করে থাকেন। এ তরিকা নিম্নস্বরে তথা যিক্‌রে খফি করার পক্ষপাতি হলেও উচ্চস্বরে তথা যিক্‌রে জলি-এর অনুসরণও করে থাকে। নকশবন্দিয়া তরিকার কোন কোন শাখা গযল ও ধর্মীয় সঙ্গীত তথার সামা'র শ্রবণ বৈধ মনে করে।

সুপ্রসিদ্ধ নকশবন্দিয়া তরিকা ও এর বিভিন্ন শাখ-প্রশাখা তুরস্ক, বাংলাদেশ, জাভা, চীন, পাকিস্তান ও ভারতসহ পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা

মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মুজাদ্দেদে আলফেসানি খ্যাত মনীষি হযরত শায়খ আহমদ ফারুকি সেরহিন্দি (র.)। তাঁকে ইমামে রাব্বানি, কাইয়ুমে যামানি প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা হয়। মুজাদ্দেদ মানে সংস্কারক। সমকালীন যুগে পবিত্র ইসলাম ও এর সার্বিক বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, নীতি-নিয়ম, হুকুম-আহকামকে যাবতীয় কুসংস্কার, বেদআত আর ইসলাম বিদ্বেষীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে তিনি ইতিহাসে মহান মুজাদ্দেদ বলে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সমসাময়িক সুফিবাদি তরিকাসমূহেরও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছিলেন।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা মূলতঃ নকশবন্দিয়া তরিকার একটি শাখা হলেও হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দ (র.) একে এমন নিখুঁতভাবে সুসংবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও সংস্কার করেছেন, যা এক নতুন ও অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি শরিয়ত ও তরিকত- ইসলামের এই দুই মূলনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁর প্রণীত তরিকায় প্রতিপালনের ধারা চালু করেছেন।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানি (র.) ৯৭১ হিজরি সনে ভারতবর্ষের সেরহিন্দ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাখদুম আবদুল আহাদ (র.) ছিলেন একজন আলেম ও সাধক মনীষি। গোটা মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে যখন শিরক, কুফর, বেদআত, কুসংস্কার ও নানাবিধ অপকর্মের বেড়াজালে ইসলাম বন্দী হয়ে পড়েছিল ঠিক এমনি এক সময়ে ইসলাম ও ইতিহাসের প্রয়োজনে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানির আগমণ ঘটে। সত্যিই তাঁর অক্লান্ত সাধনা আর নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলাম তাঁর নিষ্কলুষ ভাবধারা ফিরে পেয়েছিল। সব ধরণের অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ

সংগ্রাম করে তিনি শেষ পর্যন্ত অন্ধকার দূরীভূত করে ইসলামের যাহেরি ও বাতেনি সূর্য উদয়নের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত রাসুলে আকরাম (স.) থেকে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানি (র.) পর্যন্ত পিরানে পিরগণের নামের ধারাবাহিকতা হলো নিম্নরূপঃ

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)
২. হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)
৩. হযরত সালমান ফারসি (রা.)
৪. হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবুবকর (র.)
৫. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.)
৬. হযরত বায়েযিদ বাস্তামি (র.)
৭. হযরত ইমাম মুসা কাযেম (র.)
৮. হযরত ইমাম আলি রেযা (র.)
৯. হযরত মারুফ আল খারকি (র.)
১০. হযরত আবুল হোসে সিররি আল সিকতি (র.)
১১. হযরত জুনায়েদ আল বাগদাদি (র.)
১২. হযরত খাজা আবু আলি রোদবারি (র.)
১৩. হযরত আবুল কাসেম নাসিরাবাদি (র.)
১৪. হযরত আবুল কাসেম গোরগানি আল কোরায়শি (র.)
১৫. হযরত আবু আলা দাক্কাক (র.)
১৬. হযরত আবু আলি ফারমেদি (র.)
১৭. হযরত খাজা ইউসুফ জামদানি (র.)

১৮. হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানি (র.)

১৯. হযরত খাজা আরিফ রেওগড়ি (র.)

২০. হযরত খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনাবি (র.)

২১. হযরত শায়খ আলি রামেথানি (র.)

২২. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা শামমাসি (র.)

২৩. হযরত সৈয়দ শামসুদ্দিন আমির কালাল (র.)

২৪. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ আল বোখারি (র.)

২৫. হযরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (র.)

২৬. হযরত খাজা ইয়াকুব চারখি (র.)

২৭. হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার (র.)

২৮. হযরত খাজা মুহাম্মদ যাহেদ ওয়াখমি (র.)

২৯. হযরত দরবেশ মুহাম্মদ আমকাঙ্গি (র.)

৩০. হযরত মাওলানা খাজেগি আমকাঙ্গি (র.)

৩১. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকিবিল্লাহ (র.)

৩২. হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দেদে আলফেসানি (র.)।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসারীগণ মনে করেন, ইসলামের প্রথম খলিফা ও আল্লাহর প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ঘনিষ্টতম সাহাবি হযরত আবুবকর (রা.) যাহেরি ও বাতেনি উভয় প্রকারের জ্ঞানই রাসুল (স.) এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। হযরত আবুবকর (রা.) ও নকশবন্দিয়া তরিকার মাধ্যমে উভয় প্রকার জ্ঞানের তালিম শেষ পর্যন্ত হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দেদে আলফেসানি (র.) এর নিকট পৌঁছে। আর তিনি এ শিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শৃংখলাবোধ আনয়ন করেন। তাঁর এই সংস্কার ও

শৃংখলাবোধের কারণে পরবর্তী পর্যায়ে এই সিলসিলা নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি স্বতন্ত্র মুজাদ্দেদিয়া তরিকা হিসেবেই ইতিহাসে স্থান লাভ করে। এমনকি তাঁর থেকে প্রবাহিত চিশতিয়া তরিকাকে চিশতিয়া-মুজাদ্দেদিয়া এবং ক্বাদেরিয়া তরিকাকে কাদেরিয়া-মুজাদ্দেদিয়া বলে অভিহিত করা হয়। মূলতঃ পুরাতন চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও ক্বাদেরিয়া তরিকাকে তিনি পরিমার্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। আর এসব করতে গিয়ে তিনি ওয়াহদাতুশ শুহুদ-এর অনুসরণ করেন।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানি (র.) তাঁর তরিকায় যিকরে জলিকে স্থান দিলেও যিকরে খফির গুরুত্ব তিনি বেশী দিতেন। তিনি খোদাপ্রেমকে শাণিত ও বর্ধিত করার মানসে সর্বপ্রকার ধর্মীয় সঙ্গীত বা সামা নিষিদ্ধ করেন। অবশ্য এ তরিকার কোন কোন শাখা যিকরে জলির উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে এবং বাজনা-বাদ্যহীন সঙ্গীত তথা হামদ্ ও নাত শ্রবণ বৈধ মনে করে।

হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দ (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দেদিয়া তরিকা ভারত, আফগানিস্তান, বার্মা, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া তরিকা

সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত শায়খ শাহাবুদ্দিন উমর বিন আবদুল্লাহ আল সোহ্‌রাওয়ার্দি (র.)। তাঁর পিতা হযরত আবু নাযির (র.) ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন বড় মাপের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, পির ও বিখ্যাত নিযামিয়া একাডেমির দায়িত্বশীল। হযরত শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দি (র.) মধ্যপন্থী গোঁড়া মুসলমানদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পবিত্র মক্কা শরিফে হজ্বব্রত পালন শেষে হযরত কবি উমর বিন আল ফরিদ (র.) এর সংস্পর্শে আসেন। জগদ্বিখ্যাত কবি ও বুযুর্গ আল্লামা শেখ সাদিরও শিক্ষক ছিলেন তিনি। সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে যুবরাজ, রাজকর্মচারী সকলেই তাঁর ভক্ত ও অনুসারী

ছিল। বস্তুতঃ সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা ক্বাদেরিয়া তরিকারই একটি শাখা হিসেবে বিবেচ্য। এ তরিকাটি এক সময় ভারত, বাংলাদেশ, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এর অনুসারীর সংখ্যাও ছিল অনেক।

মৌলাভিয়া তরিকা

পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসের শ্রেষ্টতম আধ্যাত্মিক কবি, সাধক ও প্রেমের বার্তাবাহক মনীষি হযরত মৌলানা জালালুদ্দিন রুমি (র.) হলেন মৌলাভিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে হযরত জালালুদ্দিন রুমি (র.) মৌলভি হিসেবে পরিচিত। আর সে কারণেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ তরিকাটি মৌলাভিয়া তরিকা হিসেবে ইতিহাসে স্থান লাভ করে। তুরস্কে এই তরিকার উৎপত্তি লাভ করে এবং উসমানিয় সম্রাটদের সময়ে এ তরিকা অত্যন্ত শক্তিশালী তরিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। মৌলাভিয়া তরিকায় সামা তথা ধর্মীয় সঙ্গীতের অধিকতর গুরুত্ব রয়েছে। এ তরিকার অনুসারীগণ সামা ও যিক্‌রের সাথে নৃত্যের তালে তালে জযবার অবস্থা সৃষ্টি করেন।

হযরত জালালুদ্দিন রুমি (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌলাভিয়া তরিকার প্রধান মুর্শেদ ও পিরগণ সাধারণত তুরস্কের কৌনিয়াতে বসবাস করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এ তরিকার যথেষ্ট প্রভাব বিরাজমান রয়েছে।

ওয়ায়েসিয়া তরিকা

ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উহুদের যুদ্ধে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র দাঁত শহিদ হওয়ার খবরে নবিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যিনি তাঁর নিজের দাঁত ভেঙ্গে ভালবাসা আর ত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই শ্রেষ্ঠতম তাবেই হযরত ওয়ায়েস আল কারনি (র.) হলেন ওয়ায়েসিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এ তরিকার অনুসারীগণ মনে করেন, তিনি প্রিয় নবি (স.) থেকে বাতেনি ভাবে তাওয়াজ্জুহ ও এলমে লাদুন্নি লাভ করেছিলেন। আমিরুল

মোমেনিন হযরত আলি (রা.) এর একনিষ্ট ভক্ত ও বিশিষ্ট সহচর হিসেবে তিনি সময়াতিবাহিত করেছেন। রাসুল (স.) এর পবিত্র দেহ মোবারকের জামা -জোব্বা প্রাপ্তির মত সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এ তরিকা এক সময় সুদুর বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

সেনুসিয়া তরিকা

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আলি আল সানুসি (র.) এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তরিকাটি মূলতঃ ক্বাদেরিয়া তরিকার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ তরিকাটিকে ওয়াহাবি সম্প্রদায় ও সুফিদের সম্মিলনের একটি মিলনক্ষেত্র বলা যায়। এ তরিকার অনুসারীগণ অধিকাংশই মালেকি মাযহাবের লোক। তরিকাটি বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই এ তরিকার মূল লক্ষ্য। হেজায, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা ও সুদানে এ তরিকার অস্তিত্ব রয়েছে।

রিফাইয়া তরিকা

হযরত আহমাদুর রিফাই (র.) (মৃত্যু ১১৮৩ খ্রি.) রিফাইয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরিকার অনুসারীগণ অনেক অলৌকিক কার্যাবলী প্রদর্শন করে থাকেন। যেমন, উত্তপ্ত লোহার শলাকা, জীবন্ত সাপ ও কাঁচ গলাধঃকরণ এবং দেহের মধ্য দিয়ে সূঁচ ও ছুরিকা প্রবিষ্টকরণ প্রভৃতি। রিফাইয়া তরিকার উৎপত্তি হয়েছিল বসরায় এবং এক সময় সিরিয়ার দামেশ্‌ক, ইন্দোনেশিয়া ও ইস্তাম্বুলে এই তরিকার প্রভাব ছিল।

সাত্তারিয়া তরিকা

হযরত শায়খ আবদুল্লাহ সাত্তার (র.) সাত্তারিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মবিনাশন পদ্ধতি নয়, বরং আত্ম জাগ্‌তি ও স্বীকৃতিতেই আল্লাহ প্রাপ্তি সম্ভব, ধ্যানে কোন সত্যজ্ঞান দিতে পারে না, নফসের বিরোধিতা করার জন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না, অস্তিত্বকে চিনে

তাওহিদে বাস করাই প্রকৃত সুফির কর্ম ইত্যাদি এই তরিকার প্রধান প্রধান মূলনীতির অংশ। সাত্তারিয়া তরিকার অনুসারীগণ অধিকাংশই জাভা ও সুমাত্রায় বসবাস করেন।

তিজানিয়া তরিকা

হযরত আহমদ তিজানি (র.) এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আলজেরিয়ার আইন মাদিতে প্রথম এই তরিকার উদ্ভব ঘটে। পরে সুদানসহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় তার বিস্তৃতি ঘটে।

হাতিমিয়া তরিকা

মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হযরত শায়খ আল আকবার ইবনুল আরাবি (র.) হাতিমিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এ তরিকা অস্তিত্বের একত্বকে স্বীকার ও প্রচার করে। এই তরিকার অনুসারীগণ সর্ব আল্লাহবাদী। এক সময় স্পেন, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে এ তরিকার ব্যাপক প্রভাব ছিল। এ তরিকাটি কাতেরিয়া তরিকার শাখা হিসেবে পরিগণিত।

সায়েদিয়া তরিকা

হযরত খাজা আবদুল ওয়াহেদ বিন সায়েদ (র.) সায়েদিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। চিশতিয়া তরিকার অন্যতম শাখা হিসেবে পরিগণিত সায়েদিয়া তরিকা কুফা, বসরাসহ অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে ছিল।

সাজিনিয়া তরিকা

সাজিনিয়া তরিকার মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আবু মাদিয়ান (র.)। পরবর্তীতে হযরত আলি সাজিনি (র.) তিউনিসিয়াতে এ তরিকাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করেন। ভিক্ষাবৃত্তি ও পরমুখাপেক্ষিতা এ তরিকায় নিষিদ্ধ। সকলকে নিজস্ব আয়ের উপর নির্ভর করতে এ তরিকা শিক্ষা দেয়। দ্বাদশ শতকে উদ্ভুত এ তরিকা রুমানিয়া, তুর্কি, মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করে।

সাবিনিয়া তরিকা

হযরত ইবনে সাবিন (র.) সাবিনিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে এ মনীষি ইন্তেকাল করেন। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এ তরিকার অনুসারীদেরকে দেখা যায়।

জুনায়েদিয়া তরিকা

ইতিহাসখ্যাত পূণ্যাত্মা মনীষি হযরত জুনায়েদ আল বাগদাদি (র.) হলেন জুনায়েদিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরিকা ক্বাদেরিয়া তরিকার একটি জনপ্রিয় ও প্রধান শাখা হিসেবে পরিগণিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেমন, কুফা, বাগদাদ, ইরান ও বসরায় এ তরিকার অনুসারী রয়েছে।

শাম্মিনি তরিকা

জুনায়েদিয়া তরিকার একটি শাখা হল শাম্মিনি তরিকা। ওয়াহাবি আন্দোলনের সাথে এঁদের মিল পরিলক্ষিত হয়। সেনুসিয়া বা সানুসিয়া তরিকার সাথেও এঁদের মিল রয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার সাধন এ তরিকার মূল লক্ষ্য। উত্তর আফ্রিকাসহ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে এ তরিকার অনুসারী রয়েছে।

শাবানি তরিকা

হযরত শায়খ আহমদ আমিশ (র.) শাবানি তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। শাবানি তরিকায় ব্যক্তিগতভাবে নীরবে যিকির করার বিধান রয়েছে। শিষ্যদেরকে একত্রিত করে, সমাবেশের মাধ্যমে যিকির করা এ তরিকায় নিষিদ্ধ। তুরস্কে এ তরিকার অস্তিত্ব রয়েছে।

কলন্দরিয়া তরিকা

অনেকের মতে, কলন্দরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্পেনের হযরত ইউসুফ (র.)। কেউ কেউ আবার পারস্যের হযরত শায়খ জামালুদ্দিন সাওয়াইজি (র.) কে কলন্দরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে কলন্দরিয়া তরিকার প্রবক্তা হলেন

হযরত শায়খ শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর (র.)। এ তরিকার অনুসারী লোকজন হাতে ও কেউ পায়ে লোহার চুড়ি পরিধান করেন। গোঁফ, চুল ও দাড়ি মুণ্ডন করেন, আবার কেউ কেউ গোঁফ, চুল ও দাড়ি কোনদিনও কাটেন না। ফরয, সুন্নত ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের পক্ষপাতী তাঁরা নন। সিরিয়া, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে এ তরিকা সম্প্রসারিত হয়েছে।

মুহাম্মদিয়া তরিকা

অনেকের মতে, এই তরিকা প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময় থেকে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই চলে এসেছে। তবে অনেকের মতে, এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আলি খাওয়াম (র.) ও হযরত শারানি (র.)। ষোড়শ শতকে মুহাম্মদিয়া তরিকার অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য হযরত শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন হাসান হানাফি মিসর (র.) ও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভি (র.) কেও এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ দাবি করেন।

গাযযালিয়া তরিকা

ইসলামের মহান সংস্কারক ও বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল গাযযালি (র.) এই তরিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইরাক, ইরান ও তুরস্কে এই তরিকা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

মাদারিয়া তরিকা

হযরত শাহ বদিউদ্দিন শাহ-ই-মাদার (র.) হলেন এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরিকা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। মাদারিয়া তরিকার অনুসারীগণ হাতে ও পায়ে লোহার বেড়ী পরিধান করে, বাঁশ নাচায় এবং মাদারের গান (এক ধরনের মুর্শিদি গান) করে থাকেন। শাহ মাদার (র.) কে বাংলাদেশে 'দাম-মাদার' বলা হয় এবং এক সময় এদেশে মাদারিয়া তরিকার যথেষ্ট প্রভাবও ছিল।

আবুল উলাইয়া তরিকা

তাপস হযরত আবুল উলা আকবরাবাদি (র.) এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশ ও ভারতে এই তরিকার অনুসারীগণ রয়েছেন।

নুরি তরিকা

নুরি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত নুর কুতুবুল আলম বাঙ্গালি (র.)। তিনি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে এই তরিকার প্রসার ঘটান। এ তরিকা এক সময় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উল্লিখিত তরিকাসমূহ ব্যতিরেকে আরো কিছু তরিকা, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এসব তরিকার নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রচুর মানুষ ইসলামের সরল-সহজ-উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ লাভ করেছিল- সেরকম প্রধান প্রধান আরো কিছু তরিকার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. যাহিরিয়া তরিকা
২. বেকতাশি তরিকা
৩. খাররাযিয়া তরিকা
৪. আহমদিয়া তরিকা
৫. কাশারিয়া তরিকা
৬. যায়েদিয়া তরিকা
৭. তাইফুরিয়া তরিকা
৮. সায়ারিয়া তরিকা
৯. আয়াযিয়া তরিকা

১০. হাকিমিয়া তরিকা

১১. খিযিরিয়া তরিকা

১২. সাহলিয়া তরিকা

১৩. আলাইয়া তরিকা

১৪. মারাযিকা তরিকা

১৫. হিবরাবিয়া তরিকা

১৬. আরাবিয়া তরিকা

১৭. যাহিদিয়া তরিকা

১৮. আকবারিয়া তরিকা

১৯. সতুহিয়া তরিকা

২০. আত্তারিয়া তরিকা

২১. শাইখিয়া তরিকা

২২. ওয়াহিদিয়া তরিকা

২৩. কামুসিয়া তরিকা

২৪. আশরাফিয়া তরিকা

২৫. বাকরিয়া তরিকা

২৬. আরুসিয়া তরিকা

২৭. বৈরামিয়া তরিকা

২৮. যাহরিয়া তরিকা

২৯. বিস্তামিয়া তরিকা

৩০. দাসুকিয়া তরিকা

৩১. বুয়ালিয়া তরিকা
৩২. গুলশানিয়া তরিকা
৩৩. হাশিমিয়া তরিকা
৩৪. ফিরদৌসিয়া তরিকা
৩৫. রওশনিয়া তরিকা
৩৬. গাউসিয়া তরিকা
৩৭. হামাদিয়া তরিকা
৩৮. জামালিয়া তরিকা
৩৯. সান্দাকিয়া তরিকা
৪০. মানসুরিয়া বা হাল্লাযিয়া তরিকা
৪১. হারিরিয়া তরিকা
৪২. হায়দারিয়া তরিকা
৪৩. ইদ্রিসিয়া তরিকা
৪৪. কাসিমিয়া তরিকা
৪৫. ইশরাকিয়া তরিকা
৪৬. কারতুসিয়া তরিকা
৪৭. ইসমাইলিয়া তরিকা
৪৮. তুরতুসিয়া তরিকা
৪৯. ফরিদিয়া তরিকা
৫০. হাবিবিয়া তরিকা
৫১. খুলুসিয়া তরিকা

৫২. হিনদিয়া তরিকা

৫৩. সকতিয়া তরিকা

৫৪. সালিহিয়া তরিকা

৫৫. খফিয়া তরিকা

৫৬. শামসিয়া তরিকা

৫৭. সাবাইয়া তরিকা

৫৮. খলিলিয়া তরিকা

৫৯. মাঘাযিয়া তরিকা

৬০. নিয়াযিয়া তরিকা

৬১. কুশাইরিয়া তরিকা

৬২. নুরবক্সিয়া তরিকা

৬৩. মাদাসিয়া তরিকা

৬৪. সাদিয়া তরিকা

৬৫. নাসিরিয়া তরিকা

৬৬. মাতবুলিয়া তরিকা

৬৭. রাশিদিয়া তরিকা

৬৮. মিসরিয়া তরিকা

৬৯. সাকিয়া তরিকা

৭০. মুরাদিয়া তরিকা

৭১. রাহালিয়া তরিকা

৭২. সালিমিয়া তরিকা

৭৩. সুহাইলিয়া তরিকা

৭৪. সালামিয়া তরিকা

৭৫. ইউসুফিয়া তরিকা

৭৬. মালিকিয়া তরিকা

৭৭. গাযিয়া তরিকা

৭৮. রুমিয়া তরিকা

৭৯. সাসানিয়া তরিকা

৮০. সৈয়াদিয়া তরিকা

৮১. সুলতানিয়া তরিকা

৮২. সিদ্দিকিয়া তরিকা

৮৩. হাশিমিয়া তরিকা

৮৪. জৈনিয়া তরিকা

৮৫. শারকাবিয়া তরিকা

৮৬. আফিফিয়া তরিকা

৮৭. তাবাইয়া তরিকা

৮৮. কাসেমিয়া তরিকা

৮৯. রায্যাকিয়া তরিকা

৯০. তালিবিয়া তরিকা

৯১. হোসাইনিয়া তরিকা

৯২. আনসারিয়া তরিকা

৯৩. আনওয়ারিয়া তরিকা

৯৪. ইউনুসিয়া তরিকা

৯৫. জালালিয়া তরিকা

৯৬. সাফারিয়া তরিকা

৯৭. হামারিয়া তরিকা

৯৮. হামদানিয়া তরিকা

৯৯. জামিরিয়া তরিকা।

মানবজাতির ইতিহাসে তরিকার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রধান ও বিশিষ্ট তরিকা হিসেবে উল্লিখিত তরিকাসমূহের কথাই বলতে হবে। আসলে মূল কয়েকটি তরিকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত তরিকাই হলো ঐসব মূল তরিকার শাখা, প্রশাখা অথবা উপশাখা হিসেবে বিবেচিত। তবু বাস্তব সত্য হলো ঐসব শাখা তরিকাসমূহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও আপন মহিমার কারণে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বকীয়তা নিয়ে ইতিহাসে স্থান দখল করে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধরণের পালন-পদ্ধতি ও রীতিকে অতিরিক্তভাবে মূল তরিকার সাধন-পদ্ধতির সাথে যোগ করায় শাখা তরিকাসমূহও মূল তরিকার ন্যায় মৌলিকত্ব নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এটি অবশ্য সত্য যে, অনেক তরিকাই কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে, বা আজ আর বিদ্যমান নেই। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া ঐসব তরিকাও এক সময় পৃথিবীতে বিখ্যাত ও বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ তরিকা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজাতির সামনে সত্য ও সুন্দরের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. আরবি ভাষায় দ্বীন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় দ্বীন সেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। সব পয়গম্বরের দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কেয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসুল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। (শাফী, মোহাম্মদ, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২), পৃষ্ঠা-১৬৮

২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৯

৩. শাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৮৫

৫. শাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত-৩

৭. শাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭

৮. খাঁ, ইব্রাহীম, আহসানউল্লাহ্, *ইছলাম সোপান*, (বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৫), পৃষ্ঠা-২৫৬

৯. পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে 'হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন, মিন ক্বাবলু ওয়া ফি হাযা' এতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মতকে 'মুসলিম' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১০. শাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫

১১. 'রাব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিইয়াতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল্লাক'-এ আয়াতে কারিমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২. শাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮, ১৬৯

১৩. খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬২

১৫. ইসলাহী, সদরুদ্দীন, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* (আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, নবম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭), পৃষ্ঠা-১৩

১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৬৭

১৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-১৩১-১৩৩

১৮. ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮, ১৯

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩

২০. *ঈমান ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগ, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩

২১. আভারসাজী, আলী (সম্পাদিত), *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান,* (ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা-৫৭৯

২২. হাযারী, আবদুর রহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা,* (নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা-১৩৮

২৩. রশীদ, ফকীর আবদুর, *সূফী দর্শন,* (প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৮০), পৃষ্ঠা-১৩৭, ১৩৮

২৪. হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮, ১৩৯

২৫. রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮, ১৩৯

২৬. বাকিবিল্লাহ, সৈয়দ ছাজ্জাদ, *এলমে তাসাউফ অন্যতম ফরজে আইন,* প্রথম খণ্ড, গৌছিয়া তাসাউফ গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৭

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল কাদের জিলানি : জীবন ও কারামত

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল কাদের জিলানি : জীবন ও কারামত

যাঁদের জ্ঞানসাধনায় ধুলার ধরণী সমৃদ্ধ এবং মাটির মানুষ উর্ধ্বলোকে মহিমান্বিত হয়েছে, হযরত আবদুল কাদের জিলানি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ট। তিনি শুষ্কভাবে, সংকীর্ণভাবে ইসলাম ও কর্তব্যনীতির চর্চা করেননি; অসীম সহৃদয়তা ও আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানব হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করতেন। তিনি জীবনকে যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা মানবপ্রেমের রসে কোমল ও সুশ্যামল এবং যে আকাশে তাকে বিস্তীর্ণ করেছিলেন, তা সত্যের অমল-জ্যোতিতে দীপ্যমান ও জ্যোতির্মান এবং কল্যাণের পুণ্যপ্রবাহে তরঙ্গায়িত।[১]

তাঁর অগণিত জীবনচরিতে বর্ণিত এবং লক্ষ লক্ষ ভক্তকুলের ভক্তি-নিস্যন্দিত বহুলপ্রচারিত গাঁথা ও কাহিনী থেকে তাঁর আসল ব্যাক্তিত্ব অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার। একদল তাঁকে এক বিশিষ্ট সুফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অভিহিত করেন, অনেকে তাঁর কারামত বা অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি একজন সংস্কারকামী, সত্যাশ্রয়ী, শুদ্ধাচারী, গোঁড়া ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। বিখ্যাত মূর ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক মহিউদ্দিন ইবনে আল আরাবি[২] তাঁকে 'কুতুব'[৩] আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

যদিও বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিকতা ও রুহানিয়াতের কদর ও মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে এবং এর স্থান ক্রমশঃ যুক্তি ও জড়বাদিতা দখল করে নিচ্ছে, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে আউলিয়ায়ে কেরাম ও গাউস-কুতুবদের প্রতি ভালবাসা, উৎসাহ ও ভক্তি হ্রাস পেয়ে তথাকথিত আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এর স্থান অধিকার করে নিচ্ছে; তথাপিও মুসলিম জাহানে এমন কেউ নেই যিনি বড়পির আবদুল কাদের জিলানির নাম শুনেননি এবং

তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। আজ অবধি এ মহান ব্যাক্তিত্বের ফায়েযের স্রোত ও উৎস সেরূপই প্রবাহমান রয়েছে, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রবাহমান ছিল। আর কেন-ই-বা থাকবেনা, এসমস্ত মহামানবদের ইহজীবন হল মৃত্যুসদৃশ এবং তাঁদের মৃত্যুর পরবর্তী কালই হল মূল জীবন অর্থাৎ তাঁদের প্রকৃত জীবন আসলে শুরু হয় তাঁদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।[৩]

বহু অভিধায় ভূষিত আবদুল কাদের জিলানি

মহামনীষী আবদুল কাদের জিলানি (র.) কে অনেক অভিধায় ভূষিত করা যায়। তিনি সমস্ত কুতুবগণের সেরা কুতুব, আউলিয়াকুল শিরোমণি, সাইয়েদ বংশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তরিকত, হাকিকত, মারিফাত ও শরিয়তে মোহাম্মদির দিশারী, ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলো বর্ধনকারী, মহান আল্লাহর খাস ও বিশিষ্ট বন্ধু, নূরে ইলাহির আকর, খোদাতাআলার তত্ত্বরূপ রহস্যাবলীর খনি, এলমে লাদুন্নির উৎস এবং তিনি সর্বোপরি মানব-দানব উভয় সম্প্রদায়ের গাউস ও সকল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধকগণের মাথার মুকুট।[৪]

তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি

হিজরি ছয় শতকে সারা মুসলিম জগতে যেমন রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা চলেছিল, সেইরকম ধর্ম ও নীতির দিক দিয়েও মুসলিমরা দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। তখনকার ইসলাম ছিলো যুগের খাঁটি ও মানব-জীবনের কল্যাণকামী পর্যায়ের বহু নিম্নস্তরের। তখন বাগদাদে আব্বাসি খলিফাদের পূর্ণ প্রতিপত্তি এবং একথা অনস্বীকার্য যে, বাগদাদ শহর একদিকে যেমন পার্থিব সুখ-সম্পদ ও কৃষ্টি-সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল, সেইরকম দুর্নীতি, অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জঘন্য লীলাভূমিও হয়ে উঠেছিল। খলিফা থেকে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারও ধর্ম বা নীতির বড় একটা বালাই ছিলো না। ইসলামের অবনতির এই চরম সন্ধিক্ষণে 'বাব-আল-হাল'বায়' আবদুল কাদের তাঁর খোতবা বা বক্তৃতা দিতেন-খলিফা, কাযি,

গভর্নর, নাগরিক, ব্যবসায়ী, ধর্ম-ব্যবসায়ী, প্রত্যেককে লক্ষ্য করে এবং প্রত্যেকের দোষত্রুটি ও পাপ-দুর্নীতিকে কঠোর ভাষায় নির্ভয়ে সমালোচনা করে ও প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ দিয়ে। প্রথমে তাঁর স্বর ছিলো ক্ষীণ, তাঁর মজলিসে সমাগম ছিলো মাত্র দশ-বারো জন লোকের। কিন্তু কালক্রমে তাঁর অমৃতময় বাণী ও অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য স্বয়ং খলিফা–উজিররাও ভিড় জমাতেন এবং তাঁর আশিসলাভধন্য মনে করতেন।[৫]

আবদুল কাদের জিলানির আগমনকালে সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় এক নৈরাজ্যের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছিল। বাগদাদ, মিশর এবং মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজা, বাদশাহগণের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ জমাট বেঁধে উঠেছিল। একে অপরের সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের উজ্জ্বল আলো প্রায় নিভু নিভু হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম জাহানের এমর পরিস্থিতির জন্য যারা ইন্দন যুগিয়েছিল, যাদের দ্বারা মুসলিম জাহানে অবিচার, অনাচার ঢুকে পড়েছিল তারা হল বাগদাদের আব্বাসিয় খলিফাগণ। আবু মুসলিম খোরাসানির সহযোগিতায় বিপ্লবের দ্বারা বনি উমাইয়ার রাজত্ব তারা ধুলিস্যাৎ করে ছিলেন। সম্পদের অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিছক পার্থিব লালসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দুনিয়ার বুকে তারাই ছিল উপরের স্তরে। জনসেবা, আত্মত্যাগ, মমতা, দয়া, উন্নয়নমূলক কাজের দিকে তাদের কোন উৎসাহ ছিলনা। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

শাসকেরা যদিও নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল কিন্তু প্রজা সাধারণের মন তারা জয় করতে পারছিলনা। জনসাধারণ ইসলামের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা করতে আরম্ভ করে দিল। তারা ইসলামের মূলনীতি, বিধি-নিষেধ এবং নির্দেশকে পরিহার করে জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করে তুলল। আরাম-আয়েশ, ভোগের স্পৃহা, শোষণ-নির্যাতন, প্রতিহিংসা, অবহেলার আগুনে জ্বলে উঠল। স্বেচ্ছাচারী খলিফাগণের অবহেলার কারণে ইসলামের মহান

ঐক্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। দেশময় অরাজকতা, কুসংস্কার, স্বার্থান্ধতা ও অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান দৃঢ় আসন করে নিয়েছিল।

সে সময় মুসলিম নামধারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইসলামের শাসন ও শান্তিপূর্ণ মূলনীতিকে ধ্বংস করা, বেদআত ও ভ্রান্ত মতবাদকে জোরদার করা, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হত্যা করাই ছিল তাদের ভ্রান্ত নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে অলূত্য সম্প্রদায়ের আন্দোলনই ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক। এই দলের অনুসারীরা ছিল চরম ধূর্ত, কপট, শট ও মুনাফেক। তারা বলে বেড়াত যে, ইসলামকে পুনর্জীবিত করা, ইসলামের কল্যাণমূলক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা, বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের আদর্শকে রূপায়িত করাই তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু মূলত তারা ছিল নেহায়েতই ভ্রান্ত মতবাদের লোক। বাস্তবে তাদের অন্তরে শুধুমাত্র একটাই চিন্তা ছিল যে, কিভাবে ইসলামকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। কিভাবে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের বিধান ও নিয়ম-নীতি বিলীন করে দেওয়া যায়। যারা তাদের চিন্দাধারাকে পছন্দ করতনা তাদেরকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করাই ছিল তাদের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র ইসলামের এই মহাবিপদের সময়ে আল্লাহতাআলা শ্রেষ্ঠ রূহানি শক্তির অধিকারী, ন্যায় ও সত্যের প্রতীক, মহাপুরুষ বড়পির আবদুল কাদের জিলানিকে প্রেরণ করলেন। তাঁর আগমনের ফলে ইসলামের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। পাপাচার পূর্ণ দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠল এবং মানুষ সত্য পথের সন্ধান পেল।[৭]

আবদুল কাদের জিলানির আগমন বার্তা

বিশ্বজগত যখন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল, ঠিক এমনি সময় তথা বিশ্ব মানবের চরম দুর্দিনে আগমণ করেছিলেন আমাদের প্রিয়নবি (সা.)। তাঁর আবির্ভাবের ফলশ্রুতি স্বরূপ গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতার সকল

অন্ধকার দূরীভূত হল। অবসান ঘটল কুসংস্কারের, সকল অনাচার এবং পাপাচারের। প্রিয়নবি (সা.) দান করলেন মানব জাতিকে একটি পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান। সেই জীবন বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হল। কিন্তু মহানবি (সা.) এবং তাঁর চার খলিফার যুগের পর বিশ্বসভা পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে লাগল। মুসলমানেরা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বিস্মৃত করতে শুরু করল এবং মুসলিম জাতি হল বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আর মুসলমান হল লক্ষ্যচ্যুত ও ভাগ্যাহত। মুসলিম জাতির এহেন দুর্দিনে আগমণ করলেন মাহবুবে সুবহানি, গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানি।[৮]

বাগদাদে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা

তৎকালে বাগদাদের খেলাফত আসনে আব্বাসি শাসকগণ দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে সমাসীন ছিলেন। আব্বাসি খলিফাদের শাসনকালে দেশে সুশাসন বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদিনের পবিত্র ও মহান আদর্শ হতে তাঁরা বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের অনুকরণে বাহ্যত তাঁরা খলিফা নামই ধারণ করেছিলেন কিন্তু খেলাফতে রাশেদার মহান আদর্শের সাথে এর কোনই সম্পর্ক ছিল না। শুধু রাজ্য বিস্তার, পার্থিব জাঁকজমক, ভোগ বিলাস ও আড়ম্বরই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম যে সাধনা, জনসেবা, পূত-চরিত্র আর বিশ্বভ্রাতৃত্বের দ্বারা সমগ্র দুনিয়াবাসীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল, তা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে তাঁদের দরবারে কেবল ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থকরণের লালসা প্রবল হয়ে উঠেছিল। একদিন যে ঐক্য-সংহতির রজ্জু সমগ্র মুসলিম জাতিকে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, সেই বন্ধন ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে ভবিষ্যতের এক অজানা ও সর্বনাশা অনৈক্য ও হানাহানির সূত্রপাত করছিল। হিংসা, বিদ্বেষ, উৎপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করতে আরম্ভ করল। স্বার্থান্বেষী, কামাতুর, বিলাসী ও আরামপ্রিয় খলিফাদের এদিকে ভ্রূক্ষেপ করার তখন

অবসর ছিলনা, ফলে দেশে এক অরাজকতার সৃষ্টি হল। ইসলামি আকায়েদের সুষ্ঠু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দেশে বহু ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়ে দলে দলে মহা রেষারেষি আরম্ভ হয়ে যায়। অন্যদিকে স্বার্থলোভী একশ্রেণীর আলেম বিভিন্ন লোভের খপ্পরে পড়ে ইসলামের প্রকৃত মূলনীতিসমূহ বর্জনপূর্বক মানুষকে অনৈসলামিক পথে পরিচালিত করতে শুরু করে। এমনি এক সময়ে দুষ্ট প্রকৃতির একদল লোক বাইরে ইসলামের পুনর্জীবিতকরণ প্রয়াসে এক আন্দোলন শুরু করে দিল। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে তারা ইসলামের ক্ষতি ও বিলোপ সাধনই কামনা করত। যেহেতু ইসলামের বিলোপ সাধনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই খাঁটি ও সত্যিকারের মুসলমানদেরকে হত্যা করা তারা পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। এমনকি তাদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুরূহ যন্ত্রণা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। দুশ্চরিত্র এবং দুরাচার লোকেরা দলে দলে তখন এদের মতবাদ গ্রহণ করতে লাগল। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং খুব সহজভাবেই এই মতবাদ চতুর্দিকে আদৃত হয়ে প্রসার লাভ করতে থাকে। পারস্য, খোরাসান এবং এর আশপাশের অঞ্চলে এই সর্বনাশা মতবাদ অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ল। কারামতি আন্দোলন নামের এই মতবাদটি সুলতান মাহমুদ গযনভি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে কুখ্যাত হাসান বিন সাব্বা নামের জনৈক ব্যক্তির দ্বারা এই আন্দোলনটি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং এই পাপিষ্টের নেতৃত্বে মুসলিম জাহান পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে মুসলিম দুনিয়া তথা ইসলাম যখন নানান প্রকার চরম সঙ্কট ও দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত ঠিক তখনই আবদুল কাদের জিলানির আবির্ভাব।[৯]

আবদুল কাদের জিলানির জন্ম

এই চিরবরেণ্য ধর্মশিক্ষক হযরত সৈয়দ আবু মোহাম্মদ আবদুল কাদের ইরান দেশে জিলান শহরে নায়েক নামক স্থানে ৪৪০ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসে

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মস্থানের নামানুসারেই নিজের নিসবা 'জিলানি' গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবু সালেহ্ একজন পাকা আলিম ও অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। আবু সালেহ বংশমর্যাদায় নবি-নন্দিনী ফাতেমা-জোহরার পুত্র ইমাম হাসানের সাক্ষাৎ বংশধর ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিবি ফাতেমার অপর পুত্র শহিদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইনের সাক্ষাৎ বংশধর আবদুল্লাহ সাতমাই- এর কন্যা।[১০]

অবশ্য অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও গবেষকের মতে, আবদুল কাদের ৪৭০ বা ৪৭১ হিজরি সনের পবিত্র রমযান মাসের পহেলা মতান্তরে একুশ তারিখে তদানিন্তন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ইরাক প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র শহর জিলানে, (যা বাগদাদ শহর থেকে প্রায় চারশ' মাইল দূরে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

অলৌকিকত্বে ভরপুর একটি জন্ম

আবদুল কাদের জিলানির জন্মের ব্যাপারটিও তাঁর অসংখ্য কারামতসমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রথমতঃ যে বয়সে মহিলারা সন্তান প্রজননের অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তেমন বয়সে আবদুল কাদের তাঁর সাধ্বী ও মহিয়সী জননী তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন। তখন তাঁর মায়ের বয়স হয়েছিল ষাট মতান্তরে একষট্রি বছর। দ্বিতীয়তঃ আবদুল কাদের মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হওয়ার প্রথম মাসেই তাঁর পুণ্যবতী মাতা স্বপ্নযোগে দেখতে পান যে, মানব জাতির আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.) এসে তাঁকে বলছেন, হে ফাতেমা! তুমি বড়ই সৌভাগ্যশীল মহিলা, কেননা তোমার গর্ভে আউলিয়াকুলের মুকুটমণি আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় মাসে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর স্ত্রী হযরত সারা (আ.) এসে তাঁকে বলেন, ফাতেমা! তোমার জীবন ধন্য। নূরে আযম তোমার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। তৃতীয় মাসে ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়া (আ.) এসে তাঁকে বলেন, ফাতেমা! সাবধানে থেকো। তোমার গর্ভে রওশন যমির স্থান লাভ করেছেন। চতুর্থ মাসে হযরত ঈসা (আ.) এর জননী মহিয়সী মারইয়াম (আ.)

এসে তাঁকে বলেন, তোমার গর্ভে জগত বরেণ্য মহামানব আগমন করেছেন। পঞ্চম মাসে হযরত খাদিজা (রা.) এসে তাঁকে বলেন, হে ফাতেমা! তোমার গর্ভে দ্বীন ইসলামের মৃতপ্রায় দেহে নতুন জীবন সঞ্চারক 'মুহিউদ্দিন' আগমন করেছেন। ষষ্ঠ মাসে আগমন করেন হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি তাঁকে বলেন, হে ভাগ্যবতী! যে মহাপুরুষের কার্যকলাপ এবং অভাবনীয় মহত্ত্বে ও গুণ-গরিমায় জগতের মানুষ মোহিত হবে, অচিরেই তিনি তোমার স্নেহের কোল আলোকিত করবেন। সপ্তম মাসে হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) এসে সুসংবাদ দেন যে, অতিসত্ত্বর সাইয়েদ গগনের দীপ্তিমান ভাস্কর তোমার কোল উদ্ভাসিত করবেন। অষ্টম মাসে হযরত ইমাম হাসান (রা.) এসে বলেন, ফাতেমা! অনতিকাল পরেই এমন এক মহাপুরুষ তোমার কোল উজ্জ্বল করবেন, যাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় মহানবী (সা.) এর মৃতপ্রায় দ্বীন নতুন বলে বলীয়ান হবে। নবম মাসে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আগমন করে তাঁকে বলেন, হে মহাভাগ্যবতী ফাতেমা! তুমি সর্বদা সাবধান ও সতর্ক থেকো। তোমার সৌভাগ্যচন্দ্র উদিত হওয়ার সময় অতি নিকটে। আউলিয়াকুলের মাথার মুকুট, কুতুবুল আকতাব অতি অল্পকালের মধ্যেই তোমার গৃহ আলোকিত করবেন। আবদুল কাদেরের মহিয়সী জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা বলেন, যেদিন আমার এই সন্তান (আবদুল কাদের) ভূমিষ্ট হয়, সেদিন আমার স্বামী সাইয়েদ আবু সালেহ মুসা স্বপ্নে দেখেন, প্রিয়নবী মোহাম্মদ (সা.) আমাদের গৃহে তাশরিফ এনে তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, হে আবু সালেহ! আল্লাহতাআলা তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। সে মহান আল্লাহর প্রিয় এবং আমারও প্রিয়পাত্র। অতি শীঘ্রই সে সমস্ত অলি ও কুতুবগণের মধ্যে এমন মর্যাদার অধিকারী হবে, যেমন সমস্ত নবী-রাসুলগণের উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।[১২]

বংশ পরিচয় ও নাম

আবদুল কাদেরের মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকেই সৈয়দ বংশীয়। তাঁর বংশসূত্র ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ নিম্নরূপ:

পিতৃবংশ : ১. আবদুল কাদের
২. আবু সালেহ মুসা
৩. আবু আবদুল্লাহ আল জিবিল্লি
৪. ইয়াহিয়া যাহেদ
৫. মোহাম্মদ
৬. দাউদ
৭. মুসা সানি
৮. আবদুল্লাহ সানি
৯. মুসালজুন
১০. আবদুল্লাহ আল মাহায
১১. হাসানুল মুসান্না
১২. ইমাম হাসান (রা.)
১৩. হযরত আলি (রা.)।

মাতৃবংশ : ১. আবদুল কাদের
২. উম্মুল খায়ের ফাতেমা
৩. আবদুল্লাহ সাওমাঈ যাহেদ
৪. আবু জামাল
৫. মোহাম্মদ

৬. মাহমুদ

৭. আবুল আতা আবদুল্লাহ

৮. কামালুদ্দিন ঈসা

৯. আবু আলাউদ্দিন মোহাম্মদ আল জাওয়াদ

১০. আলি আল রেযা

১১. মুসা আল কাযেম

১২. ইমাম জাফর সাদেক

১৩. ইমাম বাকের

১৪. ইমাম যাইনুল আবেদিন

১৫. ইমাম হোসাইন (রা.)

১৬. হযরত আলি (রা.)।

উপরোক্ত উভয় নসবনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাগ্যবান হাসানি এবং হোসাইনি সাইয়েদ।[১৩]

তাঁর পবিত্র, সম্মানিত ও বিশ্ববিশ্রুত নাম 'আবদুল কাদের', কুনিয়াত 'আবু মোহাম্মদ', উপাধি 'মহিউদ্দিন'। আমাদের এতদাঞ্চলে তিনি সাধারণভাবে 'কুতুবুল আকতাব', 'গাউসুল আযম' এবং 'বড়পির' হিসেবে খ্যাত। কোন কোন স্থানে তাঁকে 'মাহবুবে সুবহানি' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। আবার কোন দেশে তাঁকে 'কুতুবে রব্বানি' নামেও অভিহিত করে থাকে। কোন অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে ' পিরানে পির দস্তগির', 'আফযালুল আউলিয়া' উপাধিতেও ভূষিত করে থাকে।[১৪]

অলি পিতার সততা ও নিষ্ঠা

আবদুল কাদেরের পিতা সাইয়েদ আবু সালেহ্ একজন বিখ্যাত অলি ছিলেন। তিনি অনেক দিন যাবত প্রেমময় আল্লাহতাআলার আরাধনায় অতিবাহিত করেন। একদিন পথ চলতে চলতে একটি নদীকূলে পৌঁছলেন। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি ব্যাকুল ও অস্থির, তাঁর দেহ অবসন্ন। চলতে তিনি অক্ষম, তাই নদীর তীরে বিশ্রাম করতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন, নদীতে একটি আনার ভাসমান রয়েছে। তখন তিনি ফলটি ভক্ষণ করলেন। ক্ষুধায় তিনি এতটাই কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, তখন অন্যকিছু চিন্তা করার অবসর তাঁর ছিলনা।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁর মনের গোপনতম প্রকোষ্টে এই প্রশ্নটি উত্থিত হয় যে, হায় আমি কি করলাম? পরদ্রব্য তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করলাম? এতো মারাত্মক অন্যায়। ধীরে ধীরে তাঁর বিবেকের এই দংশন তীব্রতর হতে লাগল। তাই তিনি ছুটে চললেন আনারের মালিকের সন্ধানে। নদী তীর ধরে অনেক দূর পদব্রজে চলার পর তিনি জানতে পারলেন যে, এর মালিক হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ সোমাই। তিনি ছিলেন একজন দরবেশ লোক। সাইয়েদ আবু সালেহ তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে সেই আনারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। এর জবাবে জ্ঞানবৃদ্ধ আবদুল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি যদি তুমি আমার নিকট বার বছর অবস্থান কর। সাইয়েদ আবু সালেহ পাপ মোচনের জন্য ছিলেন অস্থির। পরদ্রব্য ভক্ষণ ছিল তাঁর নিকট মহাপাপ। আর এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্য করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গ আবদুল্লাহর প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

দিবস, সপ্তাহ, মাস এবং বছরের নামে কাল অতিবাহিত হতে লাগল এবং সাইয়েদ আবু সালেহ-এর অধ্যবসায় ও সাধনাও অব্যাহত রইল। আর এভাবেই সুদীর্ঘ বার বছর কেটে

গেল। এরপর তাপস আবদুল্লাহ বললেন, আমার আরও একটি শর্ত রয়েছে। তুমি যদি আমার একটি অন্ধ, বোবা ও খোড়া কন্যার পানি গ্রহণ কর এবং আরও দুই বছরকাল এখানে অবস্থান কর তাহলে তোমায় ক্ষমা করে দেব। এই প্রস্তাবে সাইয়েদ আবু সালেহ বিস্মিত হলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এখানে তাঁর আগমন, সেই উদ্দেশ্য তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। আর তাই এই প্রস্তাবেও তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। যথাসময়ে সাইয়েদ আবু সালেহ-এর সাথে আবদুল্লাহ সোমাই-এর কন্যার শুভ পরিণয় হল।

কিন্তু বাসর গৃহে সাইয়েদ আবু সালেহ যাকে দেখতে পেলেন তিনি অন্ধও নন, বোবাও নন এবং খোড়াও নন। তাই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহত্যাগ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ সবকিছু আঁচ করতে পেরে জামাতাকে বললেন, আমার কন্যা সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত সকল বিবরণই সত্য। বলেছিলাম আমার কন্যা অন্ধ, কেননা সে কোনদিন কোন পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। বলেছিলাম সে বোবা, কেননা সে কোনদিন অন্যায়, অপবিত্র কথা শ্রবণ করেনি। বলেছিলাম আমার কন্যা খোড়া, কেননা তার পদযুগল ভুলবশতঃও ভ্রান্তপথে গমন করেনি। অতএব তাকে অন্ধ, বোবা এবং খোড়া বললে এতে আদৌ কোন অতিশয়োক্তি হয়নি। এইভাবে শুরু হয় সাইয়েদ আবু সালেহ-এর দাম্পত্য জীবন। বলাবাহুল্য এই মহিয়সী নারীই হযরত আবদুল কাদের জিলানির মাতা উম্মুল খায়ের ফাতেমা।[১৫]

মায়ের স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন

যখন বিবি ফাতেমার বয়স ষাট বছর, তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং তাঁর প্রথম মাসে বিবি হাওয়া স্বপ্নযোগে বিবি ফাতেমাকে এই সুসংবাদ দিলেন এই সুসংবাদ দিলেন, হে খায়রুন্নেছা! তোমার গর্ভে গাউসুল আযমের আগমন ঘটেছে, অতএব তুমি ধন্যবাদের পাত্রী। দ্বিতীয় মাসে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পত্নী বিবি সারাহ স্বপ্নে আগমন করে এমনি

সুসংবাদ দিলেন। তৃতীয় মাসে বিবি আসিয়া, চতুর্থ মাসে বিবি মারইয়াম, পঞ্চম মাসে বিবি খাদিজা, ষষ্ঠ মাসে হযরত আয়েশা, সপ্তম মাসে হযরত ফাতেমা এবং অষ্টম মাসে হযরত ইমাম হাসানের পত্নী বিবি যায়নাব স্বপ্নে আগমন করে গাউসুল আযমের আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেন।[১৬]

আবদুল কাদেরের স্বতন্ত্র মর্যাদা

আল্লাহতাআলা সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলেন। আদম (আ.) এর দিনগুলো তথায় সুখ-স্বাচ্ছন্দের মাঝে অতিবাহিত হতে লাগল। একদা আল্লাহতাআলা হযরত আদম (আ.) এর পিঠে তাঁর রহমতের কুদরতি হাত স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে আদম (আ.) হতে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সকল জীবের রূহ সৃষ্টি হয়ে দলে দলে অনেক রকমের ভঙ্গিতে তাঁর সামনে চলাচল করতে আরম্ভ করল। তখন হযরত আদম (আ.) আল্লাহতাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আমার সামনে যে সব রূহ আ আত্মা চলাচল করছে আসলে ওরা কারা? আল্লাহতাআলা বললেন, হে আদম! তুমি আজ তাদেরকে চিনে রাখ। তাদেরকে একত্রে দেখার সুযোগ আর তোমার জীবনে হবেনা। এরপর আদম (আ.) চেয়ে দেখলেন যে, প্রথমে নবী-রাসুলগণের আত্মার কাফেলা, তারপর অলি-আল্লাহগণের আত্মার কাফেলা এবং এরপর দেখলেন মোমেন বান্দাগণের কাফেলা। সেই আত্মাগুলো একের পর এক ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খুব সুমধুর কণ্ঠে পরম দয়ালু আল্লাহর নাম যিক্‌র করছে। হঠাৎ হযরত আদম (আ.) লক্ষ্য করলেন যে, অলিগণের আত্মার দলের সামনে যে আত্মাটি চলাফেরা করছে সেই আত্মাটি খুবই সুন্দর আর মনোমুগ্ধকর। সহসাই অনিন্দ্য সুন্দর আত্মাটি হযরত আদম (আ.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। তখন আদম (আ.) আত্মাটির অপূর্ব জ্যোতিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে আবার আল্লাহতাআলার নিকট ফরিয়াদ জানালেন সেই আত্মার পরিচয় জানার জন্যে।

আল্লাহতাআলা বললেন, হে আদম! তুমি সুসংবাদ শুনে রাখ, তোমার এই সন্তানের নাম হল মহিউদ্দিন আবদুল কাদের। নবুয়তের দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, যখন পৃথিবীতে তোমার বংশধররা বিপথগামী হতে থাকবে তখনই তাঁর আগমণ ঘটবে। সে হবে সমস্ত সৃষ্টির কাছে খুব মর্যাদাবান ও মারেফাতের সর্বগুণে গুনান্বিত ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ট সংস্কারক। সে হবে আউলিয়া-দরবেশদের মাছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর পিঠে থাকবে আমার প্রিয় হাবিব হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর পায়ের চিহ্ন। আমার এই বান্দা ইসলামের গৌরব ও সঠিক নীতিমালাকে সুসংঘবদ্ধ করে দুনিয়া ও আখেরাতে স্বীয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করবে।[১৭]

শৈশব ও বাল্যকালে আবদুল কাদের

শৈশব কালে হযরত বড়পির আবদুল কাদের জিলানি ছিলেন অত্যন্ত সংযত, অতীব গম্ভীর ও সর্বদা গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তিনি গ্রাম্য মক্তবে প্রেরিত হলেন এবং প্রথম দিনই পবিত্র কুরআনের ১৯ পারা কণ্ঠস্থ শুনিয়ে সকলকে বিস্ময়াভিভূত করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এভাবে এই রহস্য উদঘাটন করলেন যে, আমার মুহতারাম মাতা পবিত্র কুরআনের ১৯ পারার হাফেজ। তিনি এই ১৯ পারা প্রত্যেক রজনীতে তেলাওয়াত করতেন আর আমি মায়ের উদরে থেকে তা শ্রবণ করতাম। এভাবে আমিও ১৯ পারা কুরআনের হাফেজ হয়ে যাই। এ অলৌকিক ঘটনা সেদিন এটাই প্রমাণ হয়েছিল যে, আবদুল কাদেরের মেধা শক্তি অসাধারণ, আর তিনিও ভবিষ্যতে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন।[১৮]

বাল্যকাল হতেই আবদুল কাদের শান্ত, নম্র, চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন আরবি ও ফারসি ভাষা, কুরআন ও প্রাথমিক শিক্ষায় অতিবাহিত হয় স্থানীয় মাদ্রাসায়। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যা অর্জনের জন্য সুদূর বাগদাদ নগরীতে গমন করেন এবং বিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসায় তফসির কুরাআন, হাদিস, ফিকাহ্, উসুল প্রভৃতি

ধর্মতত্ত্ব এবং তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চশিক্ষা আরম্ভ করেন। বাগদাদে গমনকালে একটি ঘটনায় তাঁর অসাধারণ মাতৃভক্তি ও আশ্চর্য সত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্নেহময়ী মাতা তাঁর প্রবাসজীবনের একমাত্র সম্বলস্বরূপ চল্লিশটি (মতান্তরে আশিটি) সোনার দিনার তাঁর অঙ্গরাখর মধ্যে সিলাই করে দেন এবং বিদায়কালে এই উপদেশ দেন : জীবনে কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না । কিশোর আবদুল কাদেরের হৃদয়-ফলকে যেন কথা কয়টি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। আমাদান নামক স্থানে তাঁর সহযাত্রী কারাভাঁ দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত ও তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। দস্যুদের মধ্যে একজন তাঁর নিকট কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি অম্লানবদনে স্বর্ণমুদ্রাগুলির কথা স্বীকার করেন ও সিলাই করা স্থান দেখিয়ে দেন। বিস্মিত দস্যু তাঁকে দলপতির নিকট হাযির করল । দলপতি তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলল : তুমি তো বেশ বোকা ! মুদ্রাগুলির কথা স্বীকার করলে কেন ? কিন্তু কিশোর আবদুল কাদের দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : আমি মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে কোনো অবস্থায় মিথ্যা কথা বলব না । তাঁর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে দস্যুদল ইসলাম গ্রহণ করে ও সদভাবে জীবন-যাপন শুরু করে।[১৯]

জ্ঞানার্জনের সূত্রপাত ও প্রাথমিক শিক্ষালাভ

ছোটকাল থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর জ্ঞান সাধনার অভিযান। এই মহান উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন, এই পথে ক্রমাগত চলতে থাকে তাঁর অবিরাম সাধনা। তাঁর বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁকে এক স্বর্গীয় দূত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি ভোগের জন্য নও, ত্যাগের জন্য। বিশ্বের বুকে আল্লাহ্ পাক তোমাকে প্রেরণ করেছেন এক মহা উদ্দেশ্যে। অতএব প্রস্তুত হও তার জন্য।[২০]

আর সেদিন হতেই হযরত আবদুল কাদের জিলানি পদার্পণ করেন আধ্যাত্মিক জগতে। ব্রতী হন তিনি অসাধারণ সাধনায়। জীবনের প্রারম্ভেই তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহতাআলার

মহান দানের আভাস, আর মহাসত্য তাঁর সামনে ধরা দিয়েছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে। হযরত আবদুল কাদের প্রথমে জ্ঞান অন্বেষণে এবং পরবর্তীতে প্রেমময় আল্লাহতাআলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য যে কঠোর সাধনা করেছেন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।[২১]

মুসলিম সমাজের নিয়মানুসারে আবদুল কাদের জিলানির শৈশবকালে শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা-মাতার মাধ্যমেই। তিনি নিজ পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গৃহে বসেই শেষ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি পবিত্র কুরআন হেফ্জ করেন। ঘরের শিক্ষার বাইরে তিনি জিলান নগরে স্থানীয় মক্তবেও বিদ্যার্জন করেন। তাঁর মেধা শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞার ফলে বাল্যজীবনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর বাল্যজীবনের ঘটনাবলী বলতে গিয়ে জনৈক চিন্তাশীল লেখক বর্ণনা করেছেন, আবদুল কাদের জিলানি মাত্র আট বছর বয়সে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, অদৃশ্য এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বলছেন, হে আবদুল কাদের! নিদ্রা ভঙ্গ করে উঠ। কেন তুমি আল্লাহকে ভুলে সুখের নিদ্রায় বিভোর হয়েছ? এবার উঠ। বিশ্বপ্রতিপালকের এবাদতে নিজেকে নিয়োজিত কর। এই স্বপ্ন দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নিদ্রার অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আল্লাহতাআলার নাম স্মরণে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।[২২]

আবদুল কাদেরের উচ্চ শিক্ষালাভ

হযরত আবদুল কাদের জিলানি স্বভাবতই অনুপম ধী-শক্তির অধিকারী হয়ে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ ও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে তাঁর অতি অল্প সময়ই ব্যয় হয়েছিল। মাদ্রাসায় মোট তেরটি শাস্ত্রে তিনি পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কঠিন আরবি ভাষায় এমন গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, চিন্তা বা চেষ্টা না করেই আকস্মিকভাবে যে কোন বিষয়ে অনর্গল কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন। তিনি

মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই মাদ্রাসার প্রত্যেক সম্মানিত শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ে তাঁর একান্ত যত্ন ও অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বিশেষ যত্নের সাথে তাঁকে শিক্ষাদান করতেন। বাগদাদের মাদ্রাসায়ে নিযামিয়ার শিক্ষকগণ কেবল যাহেরি এল্‌মেই শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন না বরং তাঁদের প্রত্যেকেই বাতেনি এল্‌ম তথা মারেফাতের দিক থেকেও উচ্চ পর্যায়ের অলি ছিলেন। তাই আবদুল কাদের যাহেরি এল্‌ম শিক্ষার সাথে সাথে বাতেনি এল্‌মের প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ছাড়াও তৎকালে বাগদাদ নগরীতে বহু নামিদামি অলি ও আলেম বসবাস করতেন এবং দেশ-বিদেশ হতে বহু মুরিদান এসে তাঁদের নিকট হতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে গমন করার মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করাও আবদুল কাদের জিলানির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করলেন। তিনি যাহেরি ও বাতেনি উভয় বিদ্যায়ই বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৩]

আঠার বছর বয়সে আবদুল কাদের মায়ের আশির্বাদ সহ উচ্চতর শিক্ষা লাভের মহান ব্রত নিয়ে তৎকালীন দুনিয়ার জ্ঞানার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ট নগরী বাগদাদ গমন করেন। হযরত আবদুল কাদের বাগদাদ শহর হতে প্রায় চারশ' মাইল দূরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের বিরাট একটা সময় বাগদাদে অতিবাহিত হয়।[২৪]

আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদে ঐতিহাসিক নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ইসলামি শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন, হাদিস, তাফসির, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ফিক্‌হ, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাঁদের ক'জন নিম্নরূপ:

১. হযরত মোহাম্মদ ইবনে হাসান বাকেল্লানি

২. হযরত মোখতার মোহাম্মদ ইবনে আলি

৩. হযরত আবুবকর আহমদ ইবনে মুযাফফর

৪. হযরত আবুল বারাকাত তালহা

৫. হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবদুল করিম

৬. হযরত আবুল মুনসুর আবদুর রহমান ইবনে তুইয়ুরি

৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ

৮. হযরত আবুল কাসেম ইবনে আহমাদ জিলান আল ফারসি

৯. হযরত আবু জাফর ইবনে আহমদ ইবনে হোসাইন কারি

১০. হযরত ইবনে মাইমুন আল ফারসি

১১. হযরত আবু তালিব আবদুল কাদির ইবনে আহমাদ

১২. হযরত আবুল ফখর মোহাম্মদ ইবনে মোখতার

১৩. হযরত আবুল বারাকাত আব্বাতুল্লাহ ইবনে মোবারক

১৪. হযরত আবুল মনসুর আবদুর রহমান এনফেরাম

১৫. হযরত আবু যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া তাবয়েমি

১৬. হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম

১৭. হযরত আবু তাসিম সুরযি আহমাদ সুরযি

১৮. হযরত আবু ইসহাক জামিল ইবনে মান্নাফ

১৯. হযরত কাযি আবু সাঈদ মোবারক ইবনে আলি মুখযুমি

২০. হযরত আবদুল খাত্তাব মাহফুয হাম্বলি

২১. হযরত আবুল হাসান মোহাম্মদ ইবনে কাযি

২২. হযরত আবদুল ওয়াফি আলি ইবনে আকিল হাম্বলি প্রমুখ।[২৫]

বাগদাদে গম্ভীর মনোনিবেশ সহকারে আবদুল কাদের তফসিরে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো তীক্ষ্ণ এবং ধারণাশক্তি ছিলো অসাধারণ। অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্ববিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষন ছিলো ‘মারিফাত’ বা আধ্যাতিক জ্ঞানলাভের দিকে এবং তাসাউফ বা ইসলামি মর্মবাদেই ছিলো তাঁর বেশি ঝোঁক। এজন্য বাগদাদের প্রত্যেক সুফি ও দরবেশের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন এবং তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এভাবেই মশহুর সাধক হযরত হাম্মাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর সাহচর্যেই আবদুল কাদের তাসাউফ তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করেন।

শিক্ষা সমাপন ও সাধনায় ঝোঁক এবং তরিকতের দীক্ষা

কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার্জনের চেয়ে ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের প্রতি আবদুল কাদের বেশি মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষা সমাপনের পর নির্জনবাসে অহোরাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এই সময় তিনি সবরকম কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করেন এবং এক অযুতেই ইশার ও ফজরের নামায আদায় করতে থাকেন। কোনো কোনো রাতে বিনিদ্রভাবে সমগ্র কুরাআন তিলাওয়াত (আবৃতি) করতেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ পরিত্যাগ করে সুস্তার নামক প্রান্তরে প্রায় পঁচিশ বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। তখন তাঁকে দেখলে দিওয়ানার মতোই মনে হতো। এভাবে কঠোর সাধনার দ্বারা তাঁর হৃদয়-মন নূরে ইলাহির রওশনিতে উদ্ভাসিত হলো, তিনি কামালিয়াত হাসিল করলেন।[২৬]

পূর্ণরূপে এল্‌মে শরিয়তের জ্ঞান হাসিল করে তিনি এল্‌মে তরিকতের দিকে মনযোগ প্রদান করেন। এ তরিকতের এল্‌ম তিনি অধিকাংশই বিখ্যাত আলেম হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এ মহাপুরুষ বাগদাদ নগরীর বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ শায়খ ছিলেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানি স্বীয় পিরে তরিকতের সাথে

সাক্ষাতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, এক সময় বাগদাদ নগরীতে ফেতনা ও ফাসাদ এত অধিক হয়ে পড়ল যে, আমি বাগদাদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও যাওয়ার সংকল্প করলাম। এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন বগলের নীচে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করলাম। হঠাৎ আমার কানে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ এল যে, কোথায় যাচ্ছি? উক্ত আওয়াজের ফলে এমন প্রবল বেগে আমার শরীরে এক ধাক্কা লাগল যে, আমি সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলাম। গায়েবি আওয়াজদাতা পুনরায় বললেন, ফিরে যাও, তোমার দ্বারা আল্লাহতাআলার প্রিয় বান্দাগণ উপকৃত হবে।

তখন আমি বললাম আমিতো শুধুমাত্র আমার দ্বিন ও ঈমানের হেফাজত করতে চাই। আল্লাহতাআলার বান্দাগণের দ্বারা আমার কি কাজ? আমি আমার ইসলাম ও ঈমানের হেফাজত করার উদ্দেশ্যে ফেতনা-ফাসাদপূর্ণ শহর থেকে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি। আবারও গায়েব থেকে আওয়াজ এল, তুমি কোথাও যেওনা। এ শহরেই অবস্থান করতে থাক। তোমার ইসলাম ও ঈমান হেফাজতে থাকবে। অতঃপর আমার উপর কতগুলো অবস্থার আবির্ভাব হলো, যা আমার কাছে কিছু দুর্বোধ্য ছিল। আমি সেই অবস্থা দেখে আল্লাহতাআলার কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন একজন লোকের সন্ধান দিন যে লোক আমাকে এ দুর্বোধ্য অবস্থার সঠিক সমাধান ও তাৎপর্য বলে দিতে পারেন। পরবর্তী দিবসে আমি মুযাফ্‌ফরিয়া হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। মুযাফ্‌ফরিয়ার কোন ঘরের দরজা খুলে এক ব্যক্তি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আবদুল কাদের! গতকাল তুমি আল্লাহতাআলার কাছে কি প্রার্থনা করেছিলে? এ শুনে আমি নীরব রইলাম, আর কিছুই বলতে পারলামনা। তারপর সেই ব্যক্তি খুবই রাগান্বিত হয়ে এমন জোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন, যে দরজার সামনের দিক হতে ধুলা-বালি উড়ে এসে আমার মুখের ও চোখের উপর পতিত হল। আমি বোকার মত সেখান হতে চলে এলাম। কিছুদূর

অগ্রসর হলে গত রজনীর মুনাজাতের কথা আমার স্মরণ হল এবং চলতে চলতে আমার ধারণা হল, এ লোকটি অবশ্যই কোন একজন অলি হবেন। তাই সেই দরজাটি খুঁজে বের করার জন্য আমি তথায় ফিরে গেলাম। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও দরজাটি খুঁজে বের করতে পারলামনা। এতে আমার মনে খুব দুঃখ হল। অনেকদিন পরে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম এবং তাঁর খেদমতে যাতায়াত করতে থাকলাম। তাঁর কাছ থেকে নিজের মনের সন্দেহের সমাধান করে তরিকতের এল্‌ম শিক্ষা করলাম। এ মহান বুযুর্গ ব্যক্তিই হলেন শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস (র.)।[২৭]

৫২১ হিজরির শেষভাগে আবদুল কাদের পুনরায় লোকালয়ে আগমন করেন এবং সুফি ইউসুফ আল হামাদানির পরামর্শে প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ক্রমেই তাঁর বাণীর জ্বলন্ত মহিমা সকলে উপলব্ধি করতে লাগল এবং দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। মাদ্রাসাটির আয়তন কালক্রমে বর্ধিত হয় এবং তাঁর শিষ্যসংখ্যায় ভরে যায়। প্রতি বুধবার প্রাতে তিনি স্থানীয় ঈদগাহে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁর শ্রোতার সংখ্যা দিন দিন এতই বর্ধিত হতে লাগল যে, স্থান সংকুলন না হওয়ায় ঈদগাহটির আয়তন চতুস্পার্শ্বে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীকালে সেখানে একটি মুসাফিরখানাও স্থাপিত হয়েছিল । তাঁর খুতবায় ইসলামের অপূর্ব মহিমা লোকচক্ষে নয়ারূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, মানুষের মনেও কালিমা বিদূরিত হয়, ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। এজন্য তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে ‘মহিউদ্দিন’ বা ইসলামের নব জন্মদাতা উপাধিতে ভূষিত করে । তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে মশহুর সুফি, আলিম, ফকিহ, খলিফা, উযির থেকে অতি সাধারণ মানুষকেও দেখা যেত এবং সকলেই তাঁর নিকট সমান ব্যবহার লাভ করত । তাঁর তিতিক্ষ, সাধনা-আরাধনায় একাগ্রতা ও উন্নত জীবন সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তিনি ‘গাউসুল আযম’ নামে পরিচিত ও কথিত হন।[২৮]

আবদুল কাদের জিলানির কর্মজীবন

হযরত আবদুল কাদের জিলানির সামনে কর্তব্য ও দায়িত্বের অপরিসীম পথ পড়েছিল। সেই মহান দায়িত্বের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য তিনি আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্তব্য পরায়ণতা কর্ম প্রতিষ্ঠায় উদগ্র আকাংখা। কর্মজীবনে মনোনিবেশ করার জন্য অলক্ষ্যে তাঁকে আহ্বান করছিল। তিনি তা উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে তিনি কর্মক্ষেত্রে বিশ্বনবি মোহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আবদুল কাদের জিলানির মধ্যেঅসাধারণ ধীশক্তি, গভীর পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন দুর্লভ গুণের সমাবেশ দেখে নিযামিয়া মাদ্রাসার খ্যাতিমান শিক্ষক ও বাগদাদের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম হযরত আবু সাঈদ মোবারক নিজের মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্বভার তাঁকে প্রদান করেন। আবদুল কাদের জিলানি নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপনের পর স্বীয় জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি বিকাশের জন্য এ দায়িত্বকে সুবর্ন সুযোগ হিসেবে মনে করে সেই মাদ্রাসা পরিচালনা ও শিক্ষাদান অত্যন্ত সুচারুরূপে চালাতে লাগলেন। লোকজন তাঁর কাছে কাংখিত জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান পেয়ে মৌমাছির মত তাঁকে ঘিরে ধরল। আবদুল কাদের জিলানি তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রমকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম ভাগের সময়কাল ছিল সকাল হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এ ভাগে তিনি হাদিস, ন্যায়বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, উসুল ও সাহিত্য বিষয়াবলী শিক্ষা দিতেন। আর দ্বিতীয় অংশের সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পর হতে এশার নামায পর্যন্ত। এসময় তিনি পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, তাওহিদ ও আইন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।[২৯]

শিক্ষক প্রদত্ত মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথেই তাঁর শিক্ষকতা এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তৎকালীন সময়ে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের সাথে তুলনা করার মত আর কেউ ছিলেন না। তাই

একাধারে যেমন এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁর মত অতুলনীয় শিক্ষক লাভ করে ধন্য হয়েছিল, তেমনি বাগদাদ বাসীগণও দীর্ঘদিন পরে তাঁদের প্রাণের লোককে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

আবদুল কাদের জিলানির জ্ঞানলাভ কেবল মাদ্রাসায় অধ্যয়নের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তাঁর জ্ঞানালোকরাশি বিকশিত হয়েছিল আলোকরশ্মির মূল উৎসস্থল থেকে। যেখানে সকল জ্ঞান ও সত্যের উৎসমুখ, সেখান থেকেই তাঁর হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্যের অমিয়ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি যে ছাত্রমহলে ব্যাপক ও গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি প্রাচীন ধরনের শিক্ষারীতিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তা এক নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। ফলে মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সুকীর্তির যশ বিভিন্ন দেশে স্রোতধারার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীগণ দলে দলে তাঁর মাদ্রাসায় এসে সমবেত হতে লাগল। তারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাঁর নিকট জ্ঞান আহরণ করাকে পরম গৌরবের বিষয় বলে মনে করত।[৩০]

শায়খ আবু সাঈদ মোবারকের কার্যকালে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ও পরিসর তেমন বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু আবদুল কাদের জিলানি এ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করার পর ক্রমান্বয়ে এর ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্রদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ক্লাসে সকলের স্থান সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে লোকেরা খোলামাঠ, গাছের ছায়া আর বাসগৃহের ছাদসমূহের উপর কিংবা রাস্তার অলিতে-গলিতে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত তাঁর তালিম গ্রহণ করতে থাকে। অতঃপর তিনি মাদ্রাসার সম্প্রসারণের জন্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সামর্থবান ব্যক্তিবর্গ তাদের সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেন। কেউ অর্থ দিয়ে, কেউবা শ্রম দিয়ে মাদ্রাসার কাজে অংশগ্রহণ করল। ফলে অল্পদিনের

মধ্যেই ক্ষুদ্র মাদ্রাসাটি একটি খ্যাতিসম্পন্ন বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আবদুল কাদের জিলানির সুযোগ্য পরিচালনায় ও তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টায় সুখ্যাতি পাওয়া এ মাদ্রাসাটিই পরবর্তীকালে তাঁরই নামানুসারে 'ক্বাদেরিয়া মাদ্রাসা' নামে পরিচিতি অর্জন করে।

মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ

আবু সাঈদ মোবারক (র.) যখন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে নিজেই তার শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তখন তার ছাত্র সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু বড়পির (র.) এ মাদ্রাসার শিক্ষকতা ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর এবং মাদ্রাসার খ্যাতি দেশ-বিদেশে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের ভিড় অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যার দরুন আগত শিক্ষার্থীদের জন্য মাদ্রাসা গৃহ এমনকি তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা প্রাঙ্গনেও স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তখন আগত লোকজন পার্শ্ববর্তী গৃহ সমূহের ছাদের ওপরে এবং বাজারের গলি ও রাস্তার ওপরে বসেই তালিম গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে তিনি মাদ্রাসা সম্প্রসারণের আবশ্যকতা জনসাধারণের সম্মূখে প্রকাশ করলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন ধনবান ও মহৎপ্রাণ লোকগণ স্বেচ্ছায় মাদ্রাসা গৃহ নির্মানার্থে প্রচুর অর্থ দান করলেন। আর আর্থিক সাহায্য প্রদানে অপারগ গরীব এবং দিন-মজুরগণ স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এমনকি বাগদাদের পূণ্যবতী মহিলাগণও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণের এ পূণ্যকাজে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র মাদ্রাসা বৃহদাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়ে গেল।

মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাগণও যে কতটুকু উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বদান্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেই তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়া যাবে। একদা এক মহিলা তার রাজমিস্ত্রী স্বামীকে সাথে নিয়ে হযরত

বড়পির (র.)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরজ করল, হযরত! ইনি আমার স্বামী। মহরানা বাবত তার নিকট আমার বিশটি স্বর্ণমুদ্রা পাওনা আছে। এই বিশটি মুদ্রার দাবী আমি দুটি শর্তে এর নিকট হতে প্রত্যাহার করছি। তার প্রথমটি হল এই যে, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আপনার মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ কাজ করবেন। আর দ্বিতীয়টি হল, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে এই চুক্তিতে রাজি থাকবেন। তবে যেহেতু তিনি এখনই আমার সাথে আবদ্ধ হয়েছেন, তাই দশটি স্বর্ণমুদ্রার দাবী আমি এখনই সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বাকী দশটি আদায় বাবত একখানা রশিদ লিখে আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি আমার স্বামীর ঐ মুদ্রার মূল্য পরিমাণ কাজ পূর্ণ হয়ে গেলে এই রসিদখানা আপনি তার নিকট দিবেন। মহিলাটি একটি কাগজে উক্ত শর্তাদি লিখে বড়পির (র.)-এর হাতে অর্পণ করে বললেন, তাঁর নিকট থেকে কাজ আদায় করে কাগজখানা তাকে ফেরত দিলেই আমি বুঝতে পারব উনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপরই তিনি আমার সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হবেন। রাজমিস্ত্রী কাজ আরম্ভ করে দিল; লোকটি ছিল একজন সত্যিকার অর্থেই দক্ষ রাজমিস্ত্রী। মনোযোগ সহকারে সে কাজ করছে। কিন্তু বড়পির (র.) অত্যন্ত কোমল চিত্তের লোক ছিলেন, তাই একসাথে রাজমিস্ত্রীর মজুরীর সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক কেটে রাখতে চাইলেন না। তাই তিনি লোকটির একদিনের কাজের মজুরী কাটতে লাগলেন ও একদিনের কাজের মজুরী নগদ দিতে থাকলেন। এভাবে তার পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রার দাবী মাফ করে মহিল প্রদত্ত শর্তের কাগজখানা তার হাতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর রাজমিস্ত্রী বাড়িতে গিয়ে এ ঘটনা তার স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলে স্ত্রী গাউসুল আজম (র.)-এর ব্যবস্থায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ বলল যে, তিনি যা ভাল মনে করেছেন, আমরাও তাতে খুশি আছি।

তৎকালীন সময়ে ক্বাদেরিয়া মাদ্রাসা ছিল জ্ঞানের আলোর ঝর্ণধারা। এ মাদ্রাসা হতে অনেক স্বনামধন্য শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে সারা দুনিয়াকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে

তুলেছেন। তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফলে পৃথিবীর বুকে সত্য জ্ঞান ও রেনেসার জোয়ার প্রবাহিত হতে লাগল। মহৎ চরিত্র, অগাধ পাণ্ডিত্য, স্বর্গীয় জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার মূর্তপ্রতীক হিসেবে যে সকল শিক্ষার্থী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জনের নাম নিম্নে পেশ করা হলো।

১. হযরত আবদুল্লাহ খাতায়েনি
২. হযরত মোহাম্মদ ইবনে আহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইন
৪. হযরত আবু মোহাম্মদ আবুল হাসান জাবারি
৫. হযরত আবদুল আযিয ইবনে আবু নসর যুবায়দি
৬. হযরত শাহ মির মোহাম্মদ জিলানি
৭. হযরত ইউসুফ ইবনে মুযাফফর আল হাকুলি
৮. হযরত আলি ইবনে আবুবকর ইবনে ইদ্রিস
৯. হযরত আহমদ ইবনে ইসমাইল ইবনে হামযা
১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ওয়ালিদ
১১. হযরত মুদাফে ইবনে আহমদ
১২. হযরত আতিক ইবনে যিয়াদ ইয়ামেনি
১৩. হযরত শরিফ আহমদ ইবনে মানসুর
১৪. হযরত উমর ইবনে মাসউদ বাযযাম
১৫. হযরত ইব্রাহিম হাদ্দাস ইয়ামেনি
১৬. হযরত আবদুল্লাহ আল আসাদ ইয়ামেনি
১৭. হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল লতিফ ইবনে আবুল হোসাইন

১৮. হযরত উমর ইবনে আহমদ ইয়ামেনি

১৯. হযরত আবদুল লতিফ ইবনে হাররানি

২০. হযরত ইব্রাহিম ইবনে বাশারাতুল আদলি প্রমূখ।[৩১]

বাগদাদে অবস্থানের সিদ্ধান্ত

হযরত বড়পির (র.) বাগদাদে তাঁর ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তির পর তিনি বন-জঙ্গলে, মরু প্রান্তরে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করে রুহানি জগতের প্রাথমিক পর্ব শেষ করে স্বীয় জন্মভূমি জিলান নগরে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি বাগদাদে অবস্থান করার কারণে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। বাগদাদের আলো বাতাস এবং মরু প্রান্তরের সঙ্গে হযরত বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর স্মৃতি ক্রমেই জড়িত হয়ে পড়েছিল। বাগদাদের অধিবাসীগণ তাঁর এ সিদ্ধান্তে রাজী হলেন না। তাঁকে বাগদাদ হতে যেতে দিতে তারা কিছুতেই সম্মত হলেন না। তাঁর বাগদাদ ছেড়ে যাওয়াকে তাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য হিসেবে মনে করলেন। বাগদাদের অশান্ত জনগণ তাঁর ওস্তাদ শায়খ আবু সাঈদ মুবারক (র.)-এর মাধ্যমে তাঁকে বাগদাদেই অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত বড়পির (র.) তাঁর ওস্তাদ ও জনগণের কথা অমান্য না করে বাগদাদেই রয়ে গেলেন।

হযরত বড়পির (র.)-এর ওস্তাদ শায়খ আবু সাঈদ মুবারক (র.) নিজের মাদ্রাসার পরিচালনার ভার তাঁর ওপর অর্পণ করলেন। ফলে তিনি স্বীয় জ্ঞান-গরীমা ও বুদ্ধি দ্বারা সমাজ ও জাতি গঠনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষাদান সুচারু রূপে চালাতে লাগলেন। এতে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ব জুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া তাঁকে এক নজর দর্শন ও তাঁর পবিত্র মুখের অমূল্য বাণী শ্রবনের জন্য অসংখ্য লোক বাগদাদে এসে সমবেত হচ্ছিল। তাঁর মুখের অমৃত বাণী শ্রবণ

করে হৃদয়-মনকে পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ নগরীতে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে অসংখ্য লোক দলে দলে এসে এই মহা-মনীষীর উপদেশ, ফয়েজ ও বরকত লাভ করার জন্য ব্যাকুলভাবে সমবেত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় বাগদাদ ত্যাগ করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তিনি বাগদাদ পরিত্যাগের বাসনা হতে নিবৃত হলেন। তাছাড়া স্নেহময়ী জননী বহুদিন আগেই এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছিলেন। সুতরাং জন্মভুমি ও গৃহ-সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার মত আর কিছুই রইল না। অতএব জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া তাঁর আর হয়ে উঠল না। এ পরিস্থিতিতে তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাগদাদে বিরাট কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করা এসমস্ত লোকদের সাথে পরম নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই না। অতএব শেষ পর্যন্ত তিনি বাগদাদে অবস্থান করা সমীচীন মনে করলেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বাগদাদকেই বেছে নিলেন। বাগদাদের অধিবাসীগণ তাঁর বাগদাদে অবস্থানের সিদ্ধান্তের কথা অবগত হয়ে অত্যাধিক আনন্দিত হন।

রাসুল (স.) কর্তৃক জনসভায় বক্তৃতার নির্দেশ

বাগদাদ নগরীতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান, দেশ-বিদেশ হতে আগত জনসাধারণকে রুহানি ইলমের সবক প্রদান এবং মাসলা-মাসায়েল ও ধর্ম বিষয়ক জটিল প্রশ্ন সমূহের সমাধান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হলেন। তিনি আগত জনগণের রুহানি ও জাহেরি প্রশ্ন সমূহের সমাধান দিতে কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমশীল ও স্বল্প ভাষণ সম্পন্ন। যে সমস্ত লোক তাঁর দরবারে নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে সমবেত হতেন, শুধু তাঁদের প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর ব্যতিত বাহুল্য কোন বাক্যই তিনি বলতেন না। ইচ্ছাকৃত ভাবে বেশি কিছু বলতে যেন তাঁর সংকোচ বোধ হত। কেননা তিনি বাল্যকাল থেকেই

পরিচালিত হয়ে আসছেন মহান রবের বা তাঁর মনোনিত প্রতিনিধির ইঙ্গিতে। এখন তার ব্যতিক্রম করবেন কিসের তাগিদে? পক্ষান্তরে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দর্শনার্থীগণ তাঁর সুধাঝরা অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য বুকে আশা নিয়ে পূণ্যময় দরবারে উপস্থিত হতেন। তাঁরা কেবল প্রশ্নটুকুর সীমিত জবাব শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হতে পারতেন না। তাঁদের অদম্য পিপাসা এতে নিবৃত হত না। আরও কিছু শোনার আকাঙ্খায় তাঁদের হৃদয় হাহাকার করত। তাঁর স্বল্প ভাষণ তাঁদের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করত। মুখ ফুটে যদিও তাদের আবেগ-অনুযোগ বের হচ্ছিল না, তথাপি তাঁদের অন্তরে বড়পির (র.)-এর মৌনতা অবলম্বন তীব্র পীড়া দিতে লাগল। এমনি ভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে একদা এক পূণ্য রজনীতে স্বপ্নযোগে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট থেকে জনসভায় বক্তৃতা করার নির্দেশ পেলেন।

৫২১ হিজরির ১৬ শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে বড়পির (র.) দু'চোখ বন্ধ করে শায়িত ছিলেন। তিনি নিদ্রায় ছিলেন না ধ্যানে ছিলেন তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন রাসুলে মাকবুল (স.) তাঁকে বলছেন, 'হে আবদুল কাদের! তুমি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছনা কেন? জবাবে তিনি বললেন, 'নানাজান! আমি একজন অনারব লোক। মধুর ভাষায় বাগ্মী আরববাসীদের সামনে, আরবি ভাষায় ভালভাবে বক্তৃতা করার মত যোগ্যতা আমার নেই।' এ কথা শুনে রাসুল (স.) বললেন, 'আচ্ছা তুমি মুখ খোল।' মুখ হা করলে রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরিফ সাতবার পাঠ করে তাঁর মুখে ফুঁক দিলেন। আয়াতটি হল, 'উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি অল মাওইযাতিল হাসানাহ।' অর্থাৎ হিকমতের সাথে এবং উত্তম নসিহত দ্বারা আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান কর।

স্বপ্নের মাধ্যমে এ নির্দেশ লাভের পর থেকে বড়পির (র.) জনতার সামনে বক্তৃতা প্রদান আরম্ভ করেন। এ সম্পর্কে বড়পির (র.) নিজেই বলেন, 'স্বপ্নযোগে নির্দেশের পর যোহরের নামায শেষ করে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি মিম্বরে আরোহন করলাম এবং উপদেশ মূলক কতিপয় বাক্য মাত্র উচ্চারণ করলাম। তা শ্রবণমাত্র উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী অজ্ঞান ও ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়ল। সেদিন হতে আমার বক্তৃতার সুনাম সমস্ত বাগদাদ শহরে প্রচার হয়ে গেল।[৩২]

এ ঘটনার পর হতে বড়পির (রঃ) দ্বিনের প্রচার কার্যে অদম্য উৎসাহ ও অপরিমেয় সাহসিকতার সাথে পালন করে চললেন। তাঁর প্রথম দিকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বাগদাদের খলিফাদের সাথে জনসাধারণের সংযোগ, শাসকদের অলসতা ও আরামপ্রিয়তা, অযোগ্য শাসনকর্তাদের কর্মবিমূখতা, মুসলিম নারী-পুরুষদের ধর্মের প্রতি উদাসিনতা, মু'তাযিলা, যায়েজি ও বেদআতিদের ভ্রান্ত মতবাদের অসাড়তার প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রভৃতি। একদিকে অর্থশালীদের অঢেল প্রাচুর্য আর আ্যাকাশচুম্বি প্রাসাদরাজির চক্ষু ঝলসানো কারুকার্য অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহার ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জনসাধারণের মর্মান্তিক দৃশ্য। এসব মর্মস্পর্শী চিত্র তিনি অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় জনসাধারণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতেন। দ্বিন ও ঈমান, নামায ও রাষ্ট্রের এমন দুর্দশা তাঁর কোমল হৃদয়ে কঠিনভাবে আঘাত হেনে ছিল। তাই তিনি সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করলেন। তাঁর এই নির্ভীক চিত্ত ও স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রথম দিকে অপরিসীম নিগ্রহ ও কষ্ট-ক্লেশ বরণ করতে হয়। কিন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরম করুণাময় আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা এবং স্বীয় ধৈর্য গুণে সমস্ত সংকট ও বিপদ থেকে তিনি সফলকাম হতে থাকেন।

তাঁর এসব সারগর্ভ নসিহত এবং জ্ঞানগর্ভ অমূল্য বাণীসমূহ শুনে মানুষের মনে-প্রাণে শান্তির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। আধ্যাত্মিক সাধকদের মনে আল্লাহর শাশ্বত স্রোত ধারা তরঙ্গ আকারে হিল্লোলিত ও সঞ্জীবিত হতে লাগল। যদিও প্রথম দিকে তাঁর মাহফিলে অধিক লোকের সমাগম হত না।

বড়পির (রঃ)-এর মাহফিলে লোক সমাগম

যাদের এই পৃথিবীতে আগমন ঘটে দেশ, জাতি ও সমাজের সমস্ত অনাচার ও পাপরাশি নিবারণের জন্য, তাঁদের হৃদয় ও মন সব সময় আল্লাহ তাআলার প্রেমে আপ্লুত থাকে। পার্থিব কোন প্রভাব বা বিষয়াদির পরোয়া তাঁরা করেন না। প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা তাঁদেরকে দমন করতে পারে না। জাতির সমস্ত পাপ, অন্যায় ও অনাচারকে ধুয়ে মুছে পূত-পবিত্র করার মহান দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত থাকে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের হৃদয়ে থাকে জিহাদের দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁরা কখনো বিচলিত বা ভগ্নোৎসাহ হন না। সংস্কারের অদম্য সাহসিকতা ও উদগ্র আকাংখার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে তাঁদের বক্তৃতার মাধ্যমে। বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) অসীম মনোবল, অদম্য উৎসাহ এবং পরম সাহসিকতার সাথে দ্বিনের প্রচার কার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি অকাট্য যুক্তি, মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর, গতিময় বাচনভঙ্গি এবং অনুপম বর্ণনাশৈলীর দ্বারা সত্য ও সুস্পষ্ট অভিমত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করা আরম্ভ করলেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তৃতার খ্যাতি ও যাদুকরী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই মাহফিলে লোক সমাগম দ্রুত থেকে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকল। অবশেষে মাহফিলের স্থান নির্ধারণে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে বৃহত্তর আঙ্গিনায়

মাহফিল করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেখানেও স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ঈদগাহ ময়দানকে বক্তৃতার জন্য বেঁছে নিলেন।[৩৩]

বড়পির (র.) ঈদগাহে বক্তৃতা মঞ্চ তৈরি করে ওয়াজ-নসিহত করতে লাগলেন। নুরুর রহমান তাঁর "গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)" নামক গ্রন্থে শায়খ আবদুল্লাহ্ জুব্বাঈ-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় সত্তর হাজার শ্রোতা তাঁর মজলিসে হাজির হতেন। আর যানবাহনের আরোহী এত অধিক পরিমাণে আসত যে, ঈদগাহের চতুর্দিকে গাড়ী-ঘোড়ার একটি চক্র হয়ে যেত। দূর হতে দৃষ্টি প্রদান করলে তা একটি মাটির স্তুপ বলে মনে হত।

তিনি "আখবারুল আখইয়ার" নামক কিতাবের বরাতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত গওসুল আযমের ওয়াজের ক্রিয়া এরূপ ছিল যে, যখন তিনি শাস্তির ধম্‌কিমূলক আয়াত পাঠ করতেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত, কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত, মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যেত। কান্নাকাটির এমন রোল পড়ে যেত যে, পূর্ণ মজলিসই বেহুশ হয়ে পড়ত। আবার যখন তিনি রহমতের আয়াত পাঠ করতেন এবং এর মর্মার্থ বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতামণ্ডলীর অন্তর ফুলের কলির মত হেসে উঠত। আবার কেউ কেউ উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে বেহুশ হয়ে পড়ত এবং মজলিস শেষ হলে হুশ ও জ্ঞান প্রাপ্ত হত। কারো কারো অবস্থা এমন হত যে, প্রাণবায়ু আল্লাহ তায়ালার হাতে সমর্পণ করে দিত।

মজলিসে চারশত লেখক সংক্ষেপে তাঁর ওয়াজ লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু বড়পির (র.)-এর ওয়াজ এত দীর্ঘ হত যে, তাঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়তেন। তাঁর ওয়াজ নসিহতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারামত এই ছিল যে, দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী সকল শ্রোতা সমভাবে শুনতে পেতেন এবং সমভাবে ফায়য লাভ করতেন।

যে ফুলে মধু সঞ্চিত থাকে সে ফুল থেকে মধু আহরণের জন্য মৌমাছি ছুটে আসে। এটাই তাদের স্বভাব। হযরত বড়পির (র.)ও এর থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর নিকট যে অনুপম মধু সঞ্চিত ছিল, তা আহরণের জন্য জ্ঞান মধুলোভী লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির মত দ্রুত বেগে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ছুটে আসতে লাগল। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ঈদগাহের বিরাট ময়দানও আর লোক সঙ্কুলানের জন্য যথেষ্ট রইল না। স্থান সমস্যা আবার প্রকট হয়ে দেখা দিল। তাই বাধ্য হয়ে শহরের বাইরে অবস্থিত সুবিশাল ঈদগাহ ময়দানে নতুন করে ওয়াজের স্থান নির্ধারণ করে নতুন বক্তৃতা মঞ্চ তৈরি করালেন। জনগণের সুবিধার্থে সভাস্থলের পাশে মুসাফিরখানা ও পান্থশালা নির্মাণ করালেন।

তিনি খুব যত্নের সাথে ওয়াজ-নসিহত এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করতেন। প্রথম প্রথম শুধু বাগদাদ ও এর আশ-পাশের স্থান সমূহে তাঁর ওয়াজের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল। অতঃপর তাঁর ওয়াজের খ্যাতি দূর-দূরান্তের শহর সমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ হতে তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য দলে দলে লোকজন বাগদাদে আসতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আলেম ও নেককার লোকদের একটি দল গঠন করলেন। তাঁরা সর্বপ্রকারের ইলম হাসিল করে বড়পির (র.)-এর নির্দেশক্রমে বিভিন্ন শহরে চলে যান এবং বান্দাদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শন করতে থাকেন।

তাঁর ওয়াজের মজলিসে বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ উলামা ও মুফতিগণ হাজির হতেন। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত উলামায়ে কেরামের নাম বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য:

448596

১. সর্বপ্রধান কাযি আবদুল মালেক ইব্ন ঈসা

২. শায়খ ইব্রাহিম ইব্ন আবদুল ওয়াহেদ আল-মোকাদ্দেসি আল-হাম্বলি

৩. শায়খ আলি ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওয়াহাব আদ্দারাজি

৪. শায়খ ওসমান

৫. শায়খ আবদুল জাব্বার ইব্ন আবুল ফজল আল-কাফাছ

৬. শায়খ আবদুল গনি ইব্ন আবদুল ওয়াহেদ আল্ মুকাদ্দেস আল্ হাফেজ

৭. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন নাছার ইব্ন হামযা আল্ বেকরি

৮. শায়খ ফকিহ্ আবুল ফাতাহ্

৯. ইমাম আবু ওমর ওসমান আল্ মুলাক্কাব বা’শাফেঈয়ে যমানা

১০. শায়খ ইব্নুল কানিরানি

১১. শায়খ আবু মোহাম্মদ মাস্উদ

১২. শায়খ আবু মোহাম্মদ আল্ ফারসি

১৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ উব্ন কারামাতুল মুকাদ্দেস আল হাম্বলি

১৪. শায়খ আবদুর রহমান ইব্ন ওসমান

১৫. শায়খ আহমদ ইব্ন সাআদ

১৬. শায়খ হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাকে আল-আনছারি

১৭. শায়খ মোহাম্মদ ইব্ন কায়েদ আল-আওয়ানি

১৮. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন সেনান আররাবিনি

১৯. শায়খ ফকিহ্ রাস্লাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন শা’বান

২০. শায়খ তালৃহা

২১. শায়খ মোহাম্মদ ইব্ন আযহার আছছায়রাফি

২২. শায়খ ইয়াহ্য়া আবারকাহ্ মাহ্ফুজ আল্ বাইহাকি।

তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত রুহানি শক্তির অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে অসিম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন, নতুবা এমন কঠিন পরিশ্রম তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে অবিশ্রান্ত গতিতে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি নিজের শারীরিক দুর্বলতা বা অপারগতার কথা প্রকাশ করেননি। তাঁর ওয়াজে থাকত উদিতভাব, আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌হাম, আল্লাহ্ তা'য়ালার ইরশাদ এবং হেদায়াতের অকুল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যখন ঢেউ উঠত তখন শ্রোতামণ্ডলী সকলেই অস্থির হয়ে পড়তেন। যখন হেকমত এবং জ্ঞানবত্তার মেঘ হতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হত তখন কারো 'ওয়াজদ' এসে পড়ত, কেউ কান্না-কাটি আরম্ভ করে দিত, কেউ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেত, কেউ অস্থির ও আত্মহারা হয়ে চিৎকার শুরু করত। কারো অন্তরে এমন অসহনীয় ধাক্কা লাগত যার ফলে তাঁর কলিজা ফেটে যেত এবং সে মহব্বতের তলোয়ারে আহত হয়ে শহীদ হয়ে যেত। নুরুর রহমান "বাহজাতুল আসরার" নামক কিতাব হতে হযরত বড়পির (র.)-এর ছাহেবযাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, বড়পিরের (র.) প্রতিটি মজলিসে দু'-চারজন শ্রোতা অবশ্যই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত। তাঁর ওয়াজ সাধারণত হেকমত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হত। তিনি কোনদিকে লক্ষ্য না করে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিতেন। আল্লাহ তাআলার দ্বিনকে উচু করে ধরার ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক চিত্তের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও মুক্ত কণ্ঠের ছিলেন। ওয়াজের সময় তাঁর মুখ হতে যেন মনিমুক্তা ঝরতে থাকত। তাঁর কথাগুলি মোতি ও হিরা-যহরতের মালার মত মনে হত। নদীর অবারিত স্রোতের মত তিনি অনর্গল বলে যেতেন।

তিনি মজলিশে আসন গ্রহণ করার পর, তাঁর ভয়ে কেহ থুথুও ফেলত না, কথাও বলত না। মজলিশের মধ্যস্থল থেকে কেউ উঠার সাহস পেত না। তিনি শ্রোতামণ্ডলীর মনে উদিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজ করতেন। প্রত্যেকেই মনে করত যেন, তাঁর মনের কথাই বলছে।

বড়পির (র.) সপ্তাহে তিন দিন বক্তৃতা করতেন। শুক্রবার দিনে ও শনিবার রাতে মাদ্রাসয়ে কাদেরিয়ায় ওয়াজ করতেন। বুধবার সকালে শহরতলীর ঈদগাহ ময়দানে ওয়াজ করতেন। এ ওয়াজ মাহ্ফিলে অতি সাধারণ স্তরের লোক থেকে শুরু করে উচ্চ থেকে অতি উচ্চস্তরের লোকজন যেমন, খলিফা, বাদশাহ, আমির, উমারা, আলেম, জ্ঞানী, সুফি-সাধক, দরবেশ এমনকি বিধর্মী কাফের-মুশরিক, ইহুদি-নাসারা, ধনী-দরিদ্র সব ধরণের লোকের সমাগম ঘটত। বিশাল জনসমুদ্রের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যেত শুধু লোক আর লোক দৃষ্ট হত। মাহফিলে উচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ-ফকিরের কোন ভেদাভেদ ছিল না। যে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। তাঁর মাহফিলে মানব ব্যতিত অগনিত জ্বিন এমনকি ফেরেশতারও আগমন ঘটত। পয়গম্বরগণের মহা-পবিত্র আত্মাসমূহের শুভাগমনে বক্তৃতা মজলিস অধিকতর গৌরবান্বিত হয়ে উঠত। অনেক সময় মজলিসের স্বার্থকতা এবং বড়পির (র.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রুহ মোবারকেরও শুভাগমন ঘটত।[৩৪]

আবদুল কাদের জিলানির পারিবারিক জীবন

আবদুল কাদের জিলানির কর্মজীবনের প্রস্তুতি পর্বের সমাপ্তির পর ৫২১ হিজরি সনে একান্ন বছর বয়সে বাগদাদে বসবাস শুরু করেন। মানুষের ভোগ-সম্ভোগের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। কিন্তু আবদুল কাদের জিলানির সে যৌবনকালীন সময় কেবল শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর মধ্যে কখনো জাগতিক ভোগ-সম্ভোগের কথা মনে হয় নি। একান্ন বছর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহের পর তিনি আরো তিনটি বিয়ে করেন।[৩৫]

হযরত আবদুল কাদের প্রকাশ্যে হিদায়াত করতে আরম্ভ করার সময় পরিণত বয়সে পরপর চারবার শাদি করেন । এই স্ত্রীদের গর্ভে তাঁর সাতাশ পুত্র ও বাইশ কন্যা জন্মগ্রহণ করে । হযরতের পারিবারিক জীবন ছিলো বড়ো মধুময় ও শান্তিময়।[৩৬]

'আত্তারারিফুল মাআরিফ' গ্রন্থে রয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুল কাদের জিলানিকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি প্রথম জীবনে বিয়ে করেন নি কেন? জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমি কখনোই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতাম না, কিন্তু কেবলমাত্র রাসুল (সা.) এর আদেশ পালনার্থেই আমি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আরো বলেন, যদিও একবার আমার মনে বিবাহ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু তাতে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কায় আমি বিবাহ হতে বিরত ছিলাম। তবে আল্লাহ তাআলার যা ইচ্ছা তা অবশ্যই পূরণ হয়ে থাকে। তবে এর জন্য সময়ও নির্দিষ্ট থাকে। অতএব যখন আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হল তখন আল্লাহ তাআলা একে একে আমাকে চারজন স্ত্রীই দান করলেন।[৩৭]

আবদুল কাদের জিলানি চারটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিণীগণও তাঁর রুহানি ফায়েয ও কামালিয়াত হতে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর মোট সন্তানের সংখ্যা উনপঞ্চাশ বর্ণনা করা হয়। তাঁদের মধ্যে বিশজন পুত্র সন্তান এবং অবশিষ্ট সকলেই কন্যা সন্তান। আবদুল কাদের জিলানির পুত্র সন্তানগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পুত্রগণ অধিক বিখ্যাত ছিলেন।

১. শায়খ আবদুল ওয়াহাব (জন্ম ৫২৩ হিজরি, মৃত্যু ৬১১ হিজরি)
২. শায়খ আবদুল আযিয (মৃত্যু ৬০২ হিজরি)
৩. শায়খ আবদুল জব্বার (মৃত্যু ৫৭৫ হিজরি)
৪. শায়খ ইয়াহিয়া (মৃত্যু ৬০০ হিজরি)
৫. শায়খ ইব্রাহিম (মৃত্যু ৫৯২ হিজরি)

৬. শায়খ আবদুল রায্যাক (জন্ম ৫২৮ হিজরি, মৃত্যু ৬০৩ হিজরি)

৭. শায়খ আবদুল্লাহ (জন্ম ৫০৮ হিজরি, মৃত্যু ৫৮৯ হিজরি)

৮. শায়খ মোহাম্মদ ঈসা (মৃত্যু ৫৭৩ হিজরি)

৯. শায়খ মূসা (মৃত্যু ৬২৮ হিজরি)

১০. শায়খ মোহাম্মদ প্রমূখ (মৃত্যু ৬০০ হিজরি)।[৩৮]

আল্লাহ প্রেমিক মহাপুরুষদের দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আসক্তি থাকে না, তাঁদের অন্তরে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই স্থান পেয়ে থাকেন। অন্য কোন কিছুতেই তাঁদের সামান্যতম লিপ্সা বা আগ্রহ থাকে না। এতদ্সত্ত্বেও পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি তাঁরা কখনো উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। ফলে তাঁরা দুনিয়াবাসীর হৃদয়ে আদর্শ মানব রূপে স্থান লাভ করে আছেন। রাসুল (সঃ)ও এ আদর্শই রেখে গেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)ও এ আদর্শ গ্রহণ করে দুনিয়ার বুকে সকলের কাছে চিরস্মরনীয় ও শ্রেষ্ঠ ওলীর আসন লাভ করে আছেন।

হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানি (রঃ)-এর জীবন যাপন প্রণালী ছিল পবিত্র, পুণ্যময় ও বরকতময়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাধনার সুমহান চুঁড়াতে অবস্থান করতেন। দুনিয়ার প্রতি মোহ, লিপ্সা বা আগ্রহ তাঁর মনে কখনো স্থান করতে পারে নি। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা সবসময় তাঁর মন জুড়ে থাকতো। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন। স্বভাবধর্মী মানব চরিত্রের সমুদয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। হযরত রাসুল (সঃ)-এর পূণ্যময় জীবনাদর্শের বাস্তবায়নের ফলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অলি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আছেন।

আবদুল কাদের জিলানির চারজন স্ত্রীর গর্ভে সর্বমোট উনপঞ্চাশজন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ২৭ জন পুত্র এবং ২২ জন কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে

কয়েকজন পুত্র-কন্যা গাউসুল আজম (রঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর বৈবাহিক জীবনকাল ছিল প্রায় চল্লিশ বছরের। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা ও একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পুত্র-কন্যাগণের সংখ্যা সম্পর্কে সমস্ত ঐতিহাসিক এবং ওলামাগণ একমত নন। শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (র.) প্রণীত 'বেহজাতুল আসরার' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বড়পির (রঃ)-এর সর্বমোট ৩২জন সন্তান-সন্ততি ছিলেন। তন্মধ্যে ১০জন পুত্র এবং ২২ জন কন্যা ছিলেন। তবে তাঁদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বুজুর্গ ছিলেন। প্রায় সকলেই নেতৃস্থানীয় আলেম এবং শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ছিলেন। তাঁদের অনেকেরই শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বয়ং বড়পির গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বুজুর্গগণের তত্ত্বাবধানে রেখে শিক্ষার সু-বন্দোবস্ত করেছিলেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর পুত্রগণের মধ্যে কেউ কেউ বাগদাদ নগরীতেই অবস্থান করেছিলেন, আবার কেউ কেউ বাগদাদ নগরী ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করতেছিলেন। তবে প্রত্যেক পুত্রই তাঁদের মহান পিতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের খেদমতে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ হতে বহুলোক কুরআন-হাদিস, ফেকাহ প্রভৃতি বিষয়ে এবং এলমে মা'রিফাতে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁদের কাছে আগমন করত।[৩৯]

পুত্র-কন্যাগণের সকলের পরিচয় বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তাই তাঁদের মধ্যে যারা স্ব-বিশেষ উল্লেখযোগ্য বা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলঃ

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব (র.)

শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব এর আর এক নাম ছিল শরফুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ। ইনি বড়পির (র.)-এর জেষ্ঠ্য পুত্র। ৫২২ হিজরি সনের শাবান মাসে বাগদাদ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় পিতার নিকটেই তাঁর বাল্য শিক্ষার শুরু হয়েছিলো। ইলমে হাদিস, ফেকাহ এবং অন্যান্য বিষয়ও প্রধানতঃ পিতার নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি তৎকালীন বহু শ্রেষ্ঠ আলেমের নিকট তাফসির, হাদিস, ফেকাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। মোট কথা বিশ বৎসর বয়সে তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় ইল্ম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইলমে মারেফাতেও তিনি গভীর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর পিতার সাথে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। হযরত বড়পির (রঃ) নিজের বয়োবৃদ্ধজনিত দুর্বলতা, বিভিন্নমূখী ব্যাপক কার্যাবলীর চাপ এবং সময়াভাবে নিজের মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব ৫৪৩ হিজরি সনে জেষ্ঠ্য পুত্র আবদুল ওয়াহাব (র.)-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

তাঁর গভীর জ্ঞান, অত্যাধিক পাণ্ডিত্য এবং অভাবনীয় যোগ্যতার কথা সারা দুনিয়ায় অতি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ে। বড়পির (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ফতোয়াও প্রদান করতেন। ইবাদত বন্দেগি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গভীর একাগ্রতা ও পরম নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতেন। বুযুর্গ পিতার ইন্তেকালের পর তিনি হেদায়েতের মসনদে সমাসীন থেকে আল্লাহ তাআলার বান্দাগণকে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন করতেন। তাঁর ওয়াজ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল ছিল। তাঁর ওয়াজের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সৌন্দর্য এই ছিল যে, এতে ইল্মি ও রুহানি উপকারিতার সাথে সাথে চাটনির মত কিছু কিছু রসিকতা এবং কৌতুকও থাকত। তিনি অত্যন্ত মধুরভাষী ছিলেন। এমনকি তাঁর উপাধিই “মধুরভাষী” হয়ে গিয়েছিল। বহু মাশায়েখও তাঁর নিকট হতে ফায়য হাসিল করেছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ

শরিফ হোসাইন বাগদাদি, আহ্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াসে' ও ইব্নে আমির তাঁরই শাগরেদ ছিলেন।

তিনি খুব পবিত্র ও উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। নিতান্ত দয়ালু এবং সদালাপী ছিলেন। দানশীলতার গুণেও খুব বিখ্যাত ছিলেন। কোন প্রার্থীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। গরীব ও মিসকিন লোকদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন।[৪০]

তৎকালীন বাগদাদের খলিফা নাছির উদ্দিন দেশের দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব মোচনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাবকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত সার্থকতার সাথে পালন করেছিলেন। ৫৯৯ হিজরি ২৫শে শাবান তারিখে তিনি ইহকাল হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। বাগদাদ নগরীর উপকণ্ঠে হালবাহ্ নামক সমাধী ক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিত করা হয়।[৪১]

হযরত শায়খ ঈশা (র.)

ইনি হযরত বড়পির (র.)-এর দ্বিতীয় পুত্র। শায়খ আবদুল ওয়াহাব (র.)-এর জন্মের অল্পদিন পরেই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। হাদিস, তাফসির, ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহেও তিনি পিতার নিকট হতে অপরিসীম জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়া, দামেস্ক নগরীর বিখ্যাত হাদিস শাস্ত্র বিশারদ হযরত শায়খ আলি ইব্নে মাহদি (র.)-এর নিকট হাদিস শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান লাভ করেন। শায়খ আবুল হাসান আরমা হতেও হাদিস শ্রবন করেন। তিনি শিক্ষকতার কাজে মশগুল ছিলেন এবং উত্তম ওয়ায়েজ ও মুফতি ছিলেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের লেখক ছিলেন। ফাসাহাত, বালাগাত, কবিত্ব, জ্ঞানবত্তা ও সাহিত্যরুচির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন। গ্রন্থ রচনায় তাঁর ছিল অসাধারণ যোগ্যতা। ইলমে তাসাউফ বিষয়ে "জাওয়াহেরুল আস্রার" ও "লাতায়েফুল

আন্‌ওয়ার” নামক দুটি কিতাব রচনা করেছিলেন। কবিতা ও কবিত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এখনও তাঁর কোন কোন কবিতা দেখতে পাওয়া যায়।[৪২]

হযরত ঈসা (র.) জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ভ্রমন করেছিলেন। বাগদাদ হতে তিনি মিসরে যান এবং সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মিসরে অবস্থান কালে তিনি কুরআন-হাদিসের শিক্ষা বিস্তার এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করাই জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মিসরের কোন কোন মাশায়েখও তাঁর নিকট হতে হাদিস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা দানকালে লোকগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বক্তৃতা নিবিষ্টমনে শ্রবণ করত। মিসরের অধিবাসীগণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর খ্যাতি মিসর হতে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি ৫৭৩ হিজরি সনের ১২ই রমযান ইন্তেকাল করেন।

হযরত শায়খ আবু বকর আবদুল আজিজ (র.)

ইনিও বড়পির (রঃ)-এর অন্যতম ছাহেবযাদা। ৫৩২ হিজরির শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও তাঁর পিতার নিকট হতেই প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাছাড়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের কাছেও শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার বিষয় সমূহের মধ্যে হাদিস শাস্ত্রই প্রাধান্য লাভ করেছিল। স্বীয় মহান পিতার ন্যায় তিনিও অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের শিক্ষা দানকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আজীবন তাতেই লেগে থাকেন। বিরাট বিরাট ধর্মীয় মাহফিল সমূহে তিনি যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করতেন। তাঁর মূল্যবান ভাষণ সমূহের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ভাষণ শোনার জন্য লোকজন নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই বহু দেশ-দেশান্তর হতে মিসরে এসে হাজির হত।

তিনি পিতার শিক্ষকতা, হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের মসনদ অলংকৃত করেছিলেন। যুগের বহু শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট হতে দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করেছিলেন। তিনি অতিশয় খোদাভীরু, পরহেযগার, শরিয়তের পাবন্দ এবং কঠোর সাধনা ও মোজাহাদার অধিকারী বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি খুবই নিরব জীবন-যাপন করতেন । তিনি ৫৮০ হিজরি সনে বাগদাদ ত্যাগ করে "জেবাল" নামক স্থানে চলে যান এবং ৬০২ হিজরির ১৮ রবিউল আউয়াল সেখানেই ইন্তেকাল করেন ও সমাহিত হন।

হযরত শায়খ আবদুল জাব্বার (র.)

বড়পির (র.)-এর পুত্র হযরত শায়খ আবদুল জাব্বার (র.)-এর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তিনিও বাল্যকাল থেকে স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁর নিকটই শিক্ষায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন। এছাড়াও তিনি তৎকালীন অন্যান্য মনীষীগণের নিকট হতে হাদিস শাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন। তিনি একজন খুবই উচ্চ স্তরের আলেম ছিলেন।

তিনি ফিকাহ শাস্ত্র নিজের বুযুর্গ পিতার নিকট এবং হাদিস শাস্ত্র শায়খ আরসাফুর ও শায়খ কাযাযের নিকট অধ্যয়ন করেন। রিয়াযত ও মুজাহাদায় বিখ্যাত ছিলেন। খুব সুফি ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। সুফি-দরবেশদের সোহবতই বেশি পছন্দ করতেন। এজন্য তিনি সদা-সর্বদা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাধক-দরবেশদের সাহচর্যেই সময় অতিবাহিত করতেন। এভাবে তিনি ইলমে মারেফাতেও যথেষ্ট জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান এবং শিক্ষাদান কার্যে মনোনিবেশ করেন। লোকেরা ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাত দু'দিকেই তাঁর নিকট হতে শিক্ষালাভ করত।

পূর্ণ যৌবনকালে ৫৭৫ হিজরির ১৯শে জিলহজ্ব মাসে বাগদাদেই ওফাত প্রাপ্ত হন এবং হালাবা মহল্লায় হযরত বড়পির (র.)-এর মুসাফিরখানা সংলগ্ন ভুমিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত শায়খ হাফেয আবদুর রায্যাক (র.)

ইনি বড়পির (রঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫২৮ হিজরীর ১৮ জিলকদ তারিখে ভুমিষ্ট হন। তিনিও শিক্ষা-দীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন স্বীয় পিতার নিকটে এবং পূর্ণতাও লাভ করেছিলেন তাঁর নিকটে। তারপরও তিনি সমসাময়িক যুগের আরও কতিপয় শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি ফিকাহ শাস্ত্রেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং কুরআনের হাফেযও ছিলেন।

ফেকাহ শাস্ত্র তিনি বুযুর্গ পিতার নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। হাদিসও তাঁর নিকট হতেই অধ্যয়ন করেছিলেন। আরও বহু মশহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিস শরিফের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি হাদিসের হাফেয ছিলেন। এজন্য তাঁকে হাফেযে হাদিস বলা হত। তিনি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। বহু মুহাদ্দেসিনে কেরাম তাঁর নিকট হতে হাদিসের অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি বিনয়ী, দানশীল ও নম্র স্বভাব বিশিষ্ট বুযুর্গ লোক ছিলেন। রাজা-বাদশাহ বা আমির-ওমরাদের নিকট যাতায়াত করা পছন্দ করতেন না। তিনি লোকজনের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করতেন না। সর্বদা তাদেরকে এড়িয়ে চলতেন। গৃহের বাইরে বিচরণ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ ছিল। কেবলমাত্র দ্বিনের প্রয়োজনেই তিনি গৃহের বাইরে যেতেন। তাছাড়া সদা-সর্বদা একাকী গৃহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকতেন। ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতে অনেক শিক্ষার্থী তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি তালেবে এল্‌ম এবং শাগরেদদের প্রতি খুব স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করতেন। ৬০২ হিজরির ৭ শাওয়াল তিনি পরলোক গমন করেন। বাগদাদ নগরীর বাবে হারবে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়েছিল। অনেকের মতে তাঁর অন্য কোন ভ্রাতার জানাযায় এত বেশি লোকের সমাগম ঘটে নি।

আদর্শ স্বামী হিসেবে আবদুল কাদের জিলানি (র.)

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) বহুমূখী কর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। কখনো তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে তিনি তার শয্যা পাশে থেকে যথোপযুক্ত সেবা-যত্ন করতেন। তাছাড়া সাংসারিক বিভিন্ন বিষয়ে খবরাখবর রাখতেন। তিনি নিজের হাতে গৃহের কাজও করতেন। প্রয়োজন বসতঃ কখনও কখনও নিজেই ঘর ঝাড়ু দিতেন, পানি তুলে আনতেন, এমনকি কখনও কখনও রান্না-বান্নাও করতেন। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে খাবার খাওয়া এবং নফল রোযা রাখা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

আদর্শ পিতা হিসেবে আবদুল কাদের জিলানি (র.)

এত অধিক পুত্র-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি এদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার সু-বন্দোবস্ত করতে সামান্যতম ক্রটি করেন নি। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পিতা। একজন আদর্শ পিতার সমস্ত গুণ ও পরিচয় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি এসমস্ত দায়-দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন। পরিবারের সকলের প্রতি তাঁর প্রীতি ও স্নেহ-ভালবাসার কোন অভাব বা কমতি ছিল না। পুত্র-কন্যাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সংসারের মায়া, পরিবার-পরিজনের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে কখনো আল্লাহপ্রেম হতে ভুলিয়ে রাখতে পারে নি। বরং এসবের মধ্যে থেকেও তিনি দিবানিশি সর্বদা আল্লাহ-প্রেমে মশগুল থাকতেন।

বড়পির (র.)-এর জীবদ্দশায় কয়েকজন ছেলে-মেয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিয়োগ-ব্যাথায় তিনি কখনো বিচলিত হন নি। পার্থিব জীবনের আগমন ও তিরোধানের বিষয়টিকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মৃত সন্তানদের দাফন-কাফন, জানাযার নামায ইত্যাদিতে তিনি স্বাভাবিকভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এম. শাহ্জাহান বিন ফজল জনৈক মুরিদ শায়খ আবদুল্লাহ জাবাই (র.) এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, গাউসুল আযম (র.) বলেন, “আমার যখনই কোন সন্তান ভূমিষ্ট হত আমি তাকে হাতে নিয়ে বলতাম যে, এটা জড় বস্তু। এটা বলে সন্তানের ওপর থেকে আমার হৃদয়ের ভালবাসার আকুলতা উঠিয়ে ফেলতাম, যার ফলে তাঁদের মৃত্যু ঘটলে আমি তার জন্য তেমন পেরেশান হতাম না।”[৪৩]

হযরত শায়খ আবদুল্লাহ জাবাই (র.) আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত গাউসুল আযম (র.)-এর নির্দিষ্ট ওয়াযের তারিখে কোন সন্তানের মৃত্যু ঘটলেও মাহফিলে তাঁর ওয়ায করতে ব্যঘাত সৃষ্টি হত না।

তাঁর এসমস্ত অপূর্ব গুণাবলী ও প্রতিভার কারণেই তিনি দুনিয়ার সমগ্র তাপসকুলের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন এবং সারা জাহানের সর্বকালের সর্বযুগের আউলিয়াদের সম্রাট রূপে পরিগণিত হয়ে আছেন।

রাসূল (সঃ) কর্তৃক জনসভায় বক্তৃতার নির্দেশ

বাগদাদ নগরীতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান, দেশ-বিদেশ হতে আগত জনসাধারণকে রুহানি এলমের সবক দান এবং মাসআলা-মাসায়েল ও ধর্ম বিষয়ক জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হলেন। তিনি আগত জনগণের রুহানি ও যাহেরি প্রশ্নসমূহের সমাধান দিতে কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমশীল ও স্বল্প ভাষণ সম্পন্ন। যে সমস্ত লোক তাঁর দরবারে নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে সমবেত হতেন, শুধু তাঁদের প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর ব্যতিত বাহুল্য কোন বাক্যই তিনি বলতেন না। ইচ্ছাকৃত ভাবে বেশি কিছু বলতে যেন তাঁর সংকোচ বোধ হত। কেননা তিনি বাল্যকাল থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছিলেন মহান আল্লাহর বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির ইঙ্গিতে। এখন

তার ব্যতিক্রম করবেন কিসের তাগিদে? পক্ষান্তরে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দর্শনার্থীগণ তাঁর সুধাঝরা অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য বুকে আশা নিয়ে পূণ্যময় দরবারে উপস্থিত হতেন। তাঁরা কেবল প্রশ্নটুকুর সীমিত জবাব শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হতে পারতেন না। তাঁদের অদম্য পিপাসা এতে নিবৃত হত না। আরও কিছু শোনার আকাঙ্খায় তাঁদের হৃদয় হাহাকার করত। তাঁর স্বল্প ভাষণ তাঁদের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করত। মুখ ফুটে যদিও তাদের আবেগ-অনুযোগ বের হচ্ছিল না, তথাপি তাঁদের অন্তরে বড়পির (র.)-এর মৌনতা অবলম্বন তীব্র পীড়া দিতে লাগল। এমনিভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে একদা এক পূণ্য রজনীতে স্বপ্নযোগে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট থেকে জনসভায় বক্তৃতা করার নির্দেশ পেলেন।

৫২১ হিজরীর ১৬ শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে বড়পির (র.) দু'চোখ বন্ধ করে শায়িত ছিলেন। তিনি নিদ্রায় ছিলেন না ধ্যানে ছিলেন তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি সপ্নে দেখেন রাসুল (স.) তাঁকে বলছেন, "হে আবদুল কাদের! লিমা লা তাতাকাল্লামু?" (হে আবদুল কাদের, তুমি জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করছনা কেন?) জবাবে তিনি বললেন-"নানাজান! আমি একজন অনারব লোক। মধুর ভাষায়, বাগ্মী আরববাসীদের সামনে আরবি ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার মত যোগ্যতা আমার নেই।" এ কথাশুনে রাসুল (স.) বললেন, "আচ্ছা তুমি মুখ খোল।" মুখ হা করলে রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরিফ সাতবার পাঠ করে তাঁর মুখে ফুঁক দিলেন। আয়াতটি হল, "উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাওইযাতিল হাসানাহ।" অর্থাৎ হেকমতের সাথে এবং উত্তম নসিহত দ্বারা আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান কর।

স্বপ্নের মাধ্যমে এ নির্দেশ লাভের পর থেকে বড়পির (র.) জনতার সামনে বক্তৃতা প্রদান আরম্ভ করেন। এ সম্পর্কে বড়পির (র.) নিজেই বলেন, "স্বপ্নযোগে নির্দেশের পর যোহরের

নামায শেষ করে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি মিম্বরে আরোহণ করলাম এবং উপদেশমূলক কতিপয় বাক্য মাত্র উচ্চারণ করলাম। তা শ্রবণমাত্র উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী অজ্ঞান ও ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়ল। সেদিন হতে আমার বক্তৃতার সুনাম সমস্ত বাগদাদ শহরে প্রচার হয়ে গেল।

এ ঘটনার পর হতে বড়পির (রঃ) দ্বিনের প্রচার কার্য অদম্য উৎসাহ ও অপরিমেয় সাহসিকতার সাথে পালন করে চললেন। তাঁর প্রথম দিকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বাগদাদের খলিফাদের সাথে জনসাধারণের সংযোগ, শাসকদের অলসতা ও আরামপ্রিয়তা, অযোগ্য শাসনকর্তাদের কর্মবিমুখতা, মুসলিম নারী-পুরুষদের ধর্মের প্রতি উদাসিনতা, মু'তাযিলা, যায়েজি ও বেদআতিদের ভ্রান্ত মতবাদের অসাড়তার প্রমাণ উপস্থাপন। একদিকে অর্থশালীদের অঢেল প্রাচুর্য আর আকাশচুম্বি প্রাসাদরাজির চোখ ঝলসানো কারুকার্য, অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহার ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জনসাধারণের মর্মান্তিক দৃশ্য। এসব মর্মস্পর্শী চিত্র তিনি অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় জনসাধারণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতেন। দ্বিন ও ঈমান, নামায ও রাষ্ট্রের এমন দুর্দশা তাঁর কোমল হৃদয়ে কঠিনভাবে আঘাত হেনেছিল। তাই তিনি সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দ্বারা প্রচন্ড আঘাত হানতে শুরু করলেন। তাঁর এই নির্ভীক চিত্ত ও স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রথম দিকে অপরিসীম নিগ্রহ ও কষ্ট-ক্লেশ বরণ করতে হয়। কিন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরম করুনাময় আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা এবং স্বীয় ধৈর্য গুনে তিনি সমস্ত সংকট ও বিপদ থেকে ক্রমান্বয়ে সফলকাম হতে থাকেন।

তাঁর এসব সারগর্ভ নসিহত এবং জ্ঞানগর্ভ, অমূল্য বাণীসমূহ শুনে মানুষের মনে-প্রাণে শান্তির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। আধ্যাত্মিক সাধকদের মনে আল্লাহর শাশ্বত স্রোতধারা তরঙ্গ আকারে হিল্লোলিত ও সঞ্জীবিত হতে লাগল।

বড়পির (র.)-এর মাহফিলে লোক সমাগম

যাদের এই পৃথিবীতে আগমন ঘটে দেশ, জাতি ও সমাজের সমস্ত অনাচার ও পাপরাশি নিবারণের জন্য, তাঁদের হৃদয় ও মন সব সময় আল্লাহ তাআলার প্রেমে আপ্লুত থাকে। পার্থিব কোন প্রভাব বা বিষয়াদির পরোয়া তাঁরা করেন না। প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা তাঁদেরকে দমন করতে পারে না। জাতির সমস্ত পাপ, অন্যায় ও অনাচারকে ধুয়ে মুছে পূত-পবিত্র করার মহান দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত থাকে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের হৃদয়ে থাকে জিহাদের দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁরা কখনো বিচলিত বা ভগ্নোৎসাহ হন না। সংস্কারের অদম্য সাহসিকতা ও উদগ্র আকাংখার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে তাঁদের বক্তৃতার মাধ্যমে। বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) অসীম মনোবল, অদম্য উৎসাহ এবং পরম সাহসিকতার সাথে প্রচারকার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি অকাট্য যুক্তি, মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর, গতিময় বাচনভঙ্গি এবং অনুপম বর্ণনাশৈলীর দ্বারা সত্য ও সুস্পষ্ট অভিমত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করা আরম্ভ করলেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তৃতার খ্যাতি ও যাদুকরী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই মাহফিলে লোক সমাগম দ্রুত থেকে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকল। অবশেষে মাহফিলের স্থান নির্ধারণে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়াল। মাদ্রাসা প্রাঙ্গন ত্যাগ করে বৃহত্তর আঙ্গিনায় মাহফিল করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেখানেও স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ঈদগাহ ময়দানকে বক্তৃতার জন্য বেঁছে নিলেন। 'গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)' নামক গ্রন্থে শায়খ আবদুল্লাহ্ জুব্বাঈ-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানিন্তন সময়ে প্রায় ৭০ হাজার শ্রোতা তাঁর মজলিসে হাজির হতেন। আর যানবাহনের আরোহী এত অধিক পরিমাণে আসত যে, ঈদগাহের চতুর্দিকে গাড়ী-ঘোড়ার একটি চক্র

হয়ে যেত। দূর হতে দৃষ্টি করলে তা একটি মাটির স্তুপ বলে মনে হত। হযরত গাউসুল আযমের ওয়াজের ক্রিয়া এরূপ ছিল যে, যখন তিনি শাস্তির ধম্‌কিমূলক আয়াত পাঠ করতেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন তখন শ্রোতামণ্ডলীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত, কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত, মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যেত। কান্নাকাটির এমন রোল পড়ে যেত যে, পূর্ণ মজলিসই বেহুশ হয়ে পড়ত। আবার যখন তিনি রহমতের আয়াত পাঠ করতেন এবং এর মর্মার্থ বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ফুলের কলির মত হেসে উঠত। আবার কেউ কেউ উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে বেহুশ হয়ে পড়ত এবং মজলিস শেষ হলে হুশ ও জ্ঞান প্রাপ্ত হত। কারো কারো অবস্থা এমন হত যে, প্রাণবায়ু আল্লাহ তায়ালার হতে সমর্পণ করে দিত।

মজলিসে চারশত লেখক সংক্ষেপে তাঁর ওয়াজ লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু বড়পির (র.)-এর ওয়াজ এত দীর্ঘ হত যে, তাঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়তেন। তাঁর ওয়াজ নসিহতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারামত এই ছিল যে, দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী সকল শ্রোতা সমভাবে শুনতে পেতেন এবং সমভাবে ফ.য়েয লাভ করতেন।

যে ফুলে মধু সঞ্চিত থাকে সে ফুল থেকে মধু আহরণের জন্য মৌমাছি ছুটে আসে। এটাই তাদের স্বভাব। হযরত বড়পির (র.)-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর নিকট যে অনুপম মধু সঞ্চিত ছিল, তা আহরণের জন্য জ্ঞান মধুলোভী লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির মত দ্রুত বেগে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ছুটে আসতে লাগল। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ঈদগাহের বিরাট ময়দানও আর লোক সঙ্কুলানের জন্য যথেষ্ট রইল না। স্থান সমস্যা আবার প্রকট হয়ে দেখা দিল। তাই বাধ্য হয়ে শহরের বাইরে অবস্থিত সুবিশাল ঈদগাহ ময়দানে নতুন করে ওয়াজের স্থান নির্ধারণ করে নতুন বক্তৃতা মঞ্চ তৈরি করালেন। জনগণের সুবিধার্থে সভাস্থলের পাশে মুসাফিরখানা ও পান্থশালা নির্মাণ করালেন।

তিনি খুব যত্নের সাথে ওয়াজ নসিহত এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করতেন। প্রথম দিকে শুধু বাগদাদ ও এর আশ-পাশের স্থানসমূহে তাঁর ওয়াজের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল। অতঃপর তাঁর ওয়াজের খ্যাতি দূর-দূরান্তের শহর সমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ হতে তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য দলে দলে লোকজন বাগদাদে আসতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আলেম ও নেককার লোকদের একটি দল গঠন করলেন। তাঁরা সর্বপ্রকারের ইলম হাসিল করে বড়পির (র.)-এর নির্দেশক্রমে বিভিন্ন শহরে চলে যান এবং জনগণকে ধর্মীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শন করতে থাকেন।

তাঁর ওয়াজের মজলিসে যুগের শ্রেষ্ট এবং প্রসিদ্ধ উলামা ও মুফতিগণ হাজির হতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উলামায়ে কেরামের নাম বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্যঃ

১. সর্বপ্রধান কাযি আবদুল মালেক ইব্ন ঈশা।
২. শায়খ ইব্রাহিম ইব্ন আবদুল ওয়াহেদ আল-মোকাদ্দেসি আল-হাম্বলি
৩. শায়খ আলি ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওয়াহাব আদ্দারাজি
৪. শায়খ ওসমান
৫. শায়খ আবদুল জাব্বার ইব্ন আবুল ফজল আল-কাফাছ
৬. শায়খ আবদুল গনি ইব্ন আবদুল ওয়াহেদ আল্মুকাদ্দেস আল্হাফেজ
৭. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন নাছার ইব্ন হামযা আল্বেকরি
৮. শায়খ ফকিহ্ আবুল ফাতাহ্
৯. ইমাম আবু ওমর ওসমান আল্মুলাক্কাব বা'শাফেঈয়ে যমানা
১০. শায়খ ইব্নুল কানিরানি
১১. শায়খ আবু মোহাম্মদ মাস্উদ
১২. শায়খ আবু মোহাম্মদ আল ফারসি

১৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন কারামাতুল মুকাদ্দেস আল হাম্বলি

১৪. শায়খ আবদুর রহমান ইব্‌ন ওসমান

১৫. শায়খ আহমদ ইব্‌ন সাআদ

১৬. শায়খ হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাকে আল-আনসারি

১৭. শায়খ মোহাম্মদ ইব্‌ন কায়েদ আল-আওয়ানি

১৮. শায়খ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সেনান আররাবিনি

১৯. শায়খ ফকিহ্ রাস্‌লাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শা'বান

২০. শায়খ তাল্‌হা

২১. শায়খ মোহাম্মদ ইব্‌ন আযহার আছছায়রাফি

২২. শায়খ ইয়াহ্‌য়া আ্বারকাহ্ মাহ্‌ফুজ আল্ বায়হাকি।

বস্তুতঃ আবদুল কাদের জিলানি (র.) ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত রুহানি শক্তির অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন, নতুবা এমন কঠিন পরিশ্রম তাঁর পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব হত না। প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে অবিশ্রান্ত গতিতে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একটি মুহুর্তের জন্যও তিনি নিজের শারীরিক দুর্বলতা বা অপারগতার কথা প্রকাশ করেন নি। তাঁর ওয়াজে থাকত উদিতভাব, আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌হাম, আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ এবং হেদায়াতের অকুল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যখন ঢেউ উঠত তখন শ্রোতামণ্ডলী সকলেই অস্থির হয়ে পড়তেন। যখন হেকমত এবং জ্ঞানবত্তার মেঘ হতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হত তখন কারো 'ওয়াজদ' এসে পড়ত, কেউ কান্না-কাটি আরম্ভ করে দিত, কেউ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেত, কেউ অস্থির ও আত্মহারা হয়ে চিৎকার শুরু করত। কারো অন্তরে এমন অসহনীয় ধাক্কা লাগত, যার ফলে তাঁর কলিজা ফেটে যেত এবং সে মহব্বতের তলোয়ারে আহত হয়ে শহীদ হয়ে যেত। মাওলানা নুরুর রহমান, ''বাহজাতুল

আসরার" নামক কিতাব হতে হযরত বড়পির (রঃ)-এর ছাহেবযাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন-'বড়পির (রঃ) প্রতিটি মজলিসে দু'-চারজন শ্রোতা অবশ্যই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত। তাঁর ওয়াজ সাধারণত হেকমত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হত। তিনি কোনদিকে লক্ষ্য না করে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিতেন। আল্লাহ তাআলার দ্বিনকে উঁচু করে ধরার ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক চিত্তের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও মুক্ত কণ্ঠ ছিলেন। ওয়াজের সময় তাঁর মুখ হতে যেন মণি-মুক্তা ঝরতে থাকত। তাঁর কথাগুলি মোতি ও হিরা-যহরতের মালার মত মনে হত। নদীর অবারিত স্রোতের মত তিনি অনর্গল বলে যেতেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) ছিলেন নির্ভীক সংস্কারক ও আল্লাহর মনোনীত কর্তব্যের দিশারী। সর্ব প্রকার কুসংস্কার, জুলুম, ধর্মহীনতা, অন্যায়-অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর বক্তৃতায় তিনি ইসলামের অতুলনীয় রূপ তুলে ধরে শিরক, বিদাআত, কুফর ও নেফাকের মুলোৎপাটন করতেন। তাঁর নির্ভীক ও সত্যাশ্রয়ী অন্তরদেশ হতে যে বাণী বের হত তা শ্রোতার কর্ণমূলে আঘাত করে মর্মমূল পর্যন্ত আন্দোলিত করত। তাঁর বক্তৃতার প্রভাব থেকে কেউই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারত না। নিজের অজান্তে প্রেমোচ্ছাসে অবচেতন হয়ে বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ে থাকত।

তিনি মজলিশে আসন গ্রহণ করার পর, তাঁর ভয়ে কেউ থুথুও ফেলত না, কথাও বলত না। মজলিশের মধ্যস্থল থেকে কেউ উঠার সাহসও পেত না। তিনি শ্রোতামণ্ডলীর মনে উদিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজ করতেন। প্রত্যেকেই মনে করত যেন, তাঁর মনের কথাই বলছেন।

সমসাময়িক আলেম ও আল্লাহ্ওয়ালাদের মাঝে বড়পির (র.)-এর অবস্থান

বড়পির (র.)-এর অবস্থান আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত ওলিদের ঘাড়ের ওপর ছিল। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ ও আউলিয়া কেরামগণ তাঁর কারামতপূর্ণ মজলিশে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর উপদেশমূলক ওয়াজ শ্রবণ করতেন। সমস্ত জীবিত ও মৃত আউলিয়ায়ে-কেরাম আত্মিক ও দৈহিকরূপে তাঁর মজলিশে হাজির হতেন। এমনকি তাঁর মজলিশে জিনেরাও উপস্থিত হত।

মাওলানা নুরুর রহমান 'দারাশিকোহ' রচিত 'সাফিনাতুল আউলিয়া' নামক কিতাবের বরাতে উল্লেখ করেছেন, একদিন বড়পির (র.) স্বীয় খায়ের ও বরকতপূর্ণ খানকাহ্ শরিফে ওয়াজের মজলিশের আয়োজন করেন। আল্লাহ তাআলা বান্দাগণের একটি বিরাট দল হযরতের অমিয় বাণী শ্রবণের জন্য আগ্রহ ভরে হাজির হলেন। হযরত শায়খ আলি হাব্বি, শায়খ বাকাঈ ইবন বোতু, শায়খ আবু সাঈদ কাইলুবি, শায়খ আবু নাজিব সোহরাওয়ার্দি, শায়খ আবুল মাসউদ, শায়খ আবুল বারাকাত ইবন মা'দান আল-ইরাকি, শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি প্রমূখ বহু শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ ও আউলিয়াগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অন্তরে হযরত শায়খের মধুর বাণী, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার সমুদ্র তরঙ্গায়িত হতে লাগল। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী তাঁদের উপদেশমুলক ওয়াজ শ্রবণ করে এশকে এলাহিতে নাচতে ছিলেন। এমন সময় হযরত শায়খ ঘোষণা করলেন, 'আমার এ কদম আল্লাহ্ ত'য়ালার সমস্ত ওলিগণের ঘাড়ের ওপর।' শায়খ আলি হাব্বি তৎক্ষণাৎ মিম্বরে উঠে তাঁর কদম মোবারক নিজের চোখের সাথে লাগালেন। অতঃপর উপস্থিত-অনুপস্থিত সমস্ত আউলিয়াকেরাম পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ ঘাড় অবনত করে দিলেন।

মাওলানা নুরুর রহমান হযরত আবু সাঈদ কাইলুবির বরাত দিয়ে আরো বলেন, 'যে সময় বড়পির (র.) এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, সে মুহূর্তে তাঁর অন্তরের ওপর আল্লাহ তাআলার 'তাজাল্লি' প্রকাশিত হয়েছে। রাসুল (সা.) ফেরেশতাদের

একটি জামাত, আল্লাহ ত'য়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেষ্ঠ আউলিয়াকেরামের আত্মাসমূহের একটি দলসহ তাশরিফ এনে হযরত শায়খকে একটি নুরানী পোষাক পড়িয়ে দিলেন। সে সময় ভূমণ্ডলের একজন ওলিও গর্দান না ঝুকিয়ে অবশিষ্ট থাকেন নি। অনারব অঞ্চলে একজন দরবেশ ঘাড় অবনত করেন নি। সঙ্গে সঙ্গেই তার বেলায়াত ছিনিয়ে নেয়া হয়। হযরত শায়খের দাবী ছিল, আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এবং রাসুল (সা.)-এর আওলাদ হওয়ার কারণে, তিনি ভিন্ন আর কোন ওলিই এ উচ্চ মর্যাদায় পৌছতে পারেন নি। 'এটি আল্লাহ তাআলার দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তাঁকে দান করেন।'

মাওলানা নুরুর রহমান হযরত আবু সাঈদ কাইলুবি এবং শায়খ খলিফা (র.)-এর বরাত দিয়ে আরো বলেন যে, 'এ দু'জন ওলি-আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)! শায়খ বড়পির (র.) দাবী করেছেন যে, তাঁর কদম সমস্ত আউলিয়াকেরামের ঘাড়ের ওপর। তা শুনে রাসুল (সা.) বলেন, ''বলবেন না কেন? তিনি তো সমগ্র জগতের কুতুব। আমি সর্বদা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করি।'

মাওলানা নুরুর রহমান আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'শায়খ আবু ওমর ছাইরাফি ও আবু মোহাম্মদ হারিমি বলেন, একদিন হযরত শায়খ ওয়াজের মধ্যস্থলে মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলেন, হে জমিনের বাসিন্দাগণ! হে আসমানের অধিবাসীগণ! চোখ খুলে আমাকে দেখ এবং যা কিছু আমি বলছি তা শোন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনি এমন বস্তু সমূহ পয়দা করেছেন যা তোমরা জান না। দ্রুত আস এবং আমার নিকট হতে কিছু শিখে লও। হে ইরাকবাসীগণ! আমার নিকট 'ওয়াজদ' এবং 'হাল' একটি পিরহানের আকারে ঝুলানো রয়েছে। তা যাকে ইচ্ছা পরিয়ে দেই। হে বৎস! বেলায়াত এবং হরেক রকমের মর্যাদা আমার এখানে রয়েছে। আমার একটি বানী শ্রবণ করার জন্য হাজার বৎসরের রাস্তা হলেও সফর করে চলে আস। হে বৎস! এ মজলিশে আল্লাহ তাআলা পোশাক বিতরণ করেন।

ইহাই সে স্থান, যেখানে আল্লাহ তাআলার অলিগণ আগমন করেন। জীবিতগণ স্বশরীরে এবং মৃতগণ আত্মিকভাবে। বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এরূপ মর্যাদাই দান করেছিলেন। বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ওয়াজের মাহফিলে মানুষের ন্যায় জিনেরাও হাজির হত। এমনকি তাঁর মজলিশে জিনের সংখ্যা মানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি হত। তাদের অধিকাংশই তাঁর হাতে মুসলমান হত এবং তওবা করত। মাওলানা নুরুর রহমান বর্ণনা করেন, হযরত আবু যাকারিয়া (র.) বলেন, আমার পিতা জিনদেরকে ডেকে হাজির করতেন। একদিন তিনি চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী জিনদের দাওয়াত করলেন। কিন্তু তারা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বিলম্বে এসে হাজির হল। আমার পিতা তাদেরকে বিলম্বে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলল, ‘‘আমরা সকলে এতক্ষণ আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর মাহফিলে ওয়াজ শ্রবণ করছিলাম। এজন্য আসতে পারিনি। ভবিষ্যতে এরূপ সময় আমাদেরকে কখনো ডাকবেন না। আমার পিতা তাঁদেরকে আরও জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের অন্যান্য সকলেও কী তাঁর ওয়াজের মজলিশে হাজির হয়ে থাকে? তারা বলল, হ্যাঁ, আমাদের ভিড় মানুষের ভিড় অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। আমাদের অধিকাংশই তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছে এবং তওবা করেছে।[৪৪]

বড়পির (র.)এর ওয়াজের মজলিশে হাজির থাকার জন্যে রাসূল (সা.)-এর আদেশ

শায়খ শরিফ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন আবুল গানায়েম (র.) বলেন, আবুল মাফাখের হাসানি বাগদাদি বলেছেন, ৫৫৫ হিজরি সনে একবার আমি আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর মাহফিলে হাজির হয়ে দেখলাম, সেখানে (১০,০০০) দশ হাজার লোকের সমাবেশ। শায়খ আলি হাব্বি তাঁর সম্মুখে মিম্বরের নিকটে উপবিষ্ট আছেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বড়পির (র.) বলে উঠলেন- শ্রোতামণ্ডলী! তোমার সকলে নিরব হয়ে যাও, কোন কথা বল না। তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করে শায়খ আলি হাব্বির নিকট স্বশ্রদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে

রইলেন। শায়খ আলি হাব্বি তন্দ্রা কেটে গেলে হযরত শায়খ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি হুজুর (সা.)- এর দিদার লাভ করেছিলে?" তিনি বললেন, হ্যাঁ, বড়পির (র.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসুল (সা.) তোমাকে কি উপদেশ প্রদান করেছেন?' শায়খ আলি হাব্বি বলেন, "তিনি আমাকে আপনার মজলিশে উপস্থিত থাকার জন্য তাগিদ করেছেন।" অতঃপর বড়পির (র.) বলেন, "এজন্যই আমি তোমার আদব করেছি এবং শ্রোতামণ্ডলীকে চুপ থাকতে আদেশ করেছি।"

লোকে হযরত শায়খ আলি হাব্বিকে জিজ্ঞেস করল, ইহা কেমন ব্যাপার? বড়পির (র.) আপনার স্বপ্নের অবস্থা কেমন করে জানলেন? তিনি বলেন, "আমি যা স্বপ্নে দেখি তিনি তা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পান।

শায়খ আবু বকর ইবন আহমদ, শায়খ হাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ওয়াজের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। জনতার মধ্যে হৈ-চৈ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হল। হযরত শায়খ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘকে বললেন, "আমি একত্র করছি আর তুমি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছ।"এতটুকু বলতেই মেঘ সে স্থান থেকে অন্যত্র সরে গেল।

বড়পির (র.)-এর ফাতওয়া

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত মাদ্রাসার অধ্যাপনা ও ফাতওয়া লেখার কাজ জারি রেখেছিলেন। মাসআলা-মাসায়েল সম্মন্ধে তাঁর এত গভীর ও অফুরন্ত জ্ঞান ছিল যে, ফাতওয়া লেখার সময় কিতাব দেখার প্রয়োজন হত না। কোন চিন্তা না করেই কলম নিয়ে জবাব দিতেন। জবাবও এমন নির্ভুল হত যে, সমগ্র ইরাকের আলেমগণ তা মেনে নিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফী ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ্র মাযহাব অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করতেন।

একবার এক অভিনব ও বিচিত্র ধরনের মাসআলা আসল। বড় বড় আলেম ও ফাজেলগণও এর উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন না। প্রশ্নটি ছিল, "এক ব্যক্তি কসম করেছিল, যদি আমি এক সপ্তাহের মধ্যে এমন কোন ইবাদত না করি, যা সে সপ্তাহে দুনিয়ার কোন মুসলমান করে নি, তবে আমার বিবির উপর তিন তালাক পতিত হবে।" (এক সপ্তাহের মধ্যে এমন একটি ইবাদত করতে হবে, যা ঐ সপ্তাহে দুনিয়ার কোন মানুষ সে ইবাদত করে নি। না করলে তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক পতিত হবে।) মাসআলাটি বড়পির (র.)-এর খেদমতে আসা মাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন যে, "প্রার্থীর কর্তব্য হবে হারাম শরিফে এমন ব্যবস্থা করে নেয়া, যে সপ্তাহে সে তাওয়াফ করবে, সে সপ্তাহে দুনিয়ার কেউ যেন কা'বার তাওয়াফ না করে। তাহলে এ ইবাদত কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হবে এবং দুনিয়ার কোন মুসলমান এ ইবাদতে তাঁর সাথে শরিক হবে না। ফলে তাঁর বিবি তালাক হতে নিরাপদ থাকবে।

বড়পির (র.)-এর ওয়াজের সময়

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ছাহেবযাদা শায়খ আবদুল ওয়াহাব (র.) বলেন, আমার বুযুর্গ পিতা সপ্তাহে তিন দিন বক্তৃতা করতেন। শুক্রবার দিনে ও শনিবার রাতে মাদ্রাসয়ে কাদেরিয়ায় এবং রবিবার বেলা খানকাহ্ শরিফে ওয়াজ করতেন। এম. শাহজাহান বিন ফজল রবিবারের পরিবর্তে বুধবারের কথা উল্লেখ করেছেন। বুধবার সকালে শহরতলীর ঈদগাহ্ ময়দানে ওয়াজ করতেন।[৪৫]

এসব ওয়াজ-মাহফিলে অতি সাধারণ স্তরের লোক থেকে শুরু করে উচ্চ থেকে অতি উচ্চ স্তরের লোকজন যেমন, খলিফা, বাদশাহ, আমির-উল-উমারা, আলেম, জ্ঞানী, সুফি-সাধক, দরবেশ এমনকি কাফের-মুশরেক, ইহুদি-নাসারা, ধনী-দরিদ্র সব ধরণের লোকের সমাগম ঘটত। বিশাল জনসমুদ্রের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যেত শুধু লোক আর লোক দৃষ্ট হত। মাহফিলে উচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ-ফকিরের কোন ভেদাভেদ ছিল না। যে যেখানে জায়গা

পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। তাঁর মাহফিলে মানব ব্যতিত অন্যান্য সৃষ্টি এমনকি ফেরেশতারও আগমন ঘটত। পয়গম্বরগণের মহা পবিত্র আত্মাসমূহের সুভাগমনে বক্তৃতা মজলিস অধিকতর গৌরবান্বিত হয়ে উঠত। অনেক সময় মজলিসের স্বার্থকতা এবং বড়পির (র.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ)-এর রুহ মোবারকেরও শুভাগমন ঘটত। এভাবে তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ওয়াজ নসিহত করেছেন। সময়ের নিশ্চয়তা এভাবে করা যায় যে, ৫১২ হিজরি হতে ৫৬১ হিজরি পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা, ওয়াজ এবং ফাতওয়া প্রদানের কাজ করেছেন। এ সমস্ত কাজ তিনি এক সঙ্গে করে গিয়েছেন। তাঁর হাতে যে সংখ্যক লোক ইসলাম ও তওবা করেছে তাঁদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ হাজার ছিল বলে কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যারা নিজেদের নফসের ও আমলের সংশোধনের জন্য তাঁর হাতে বায়আত করেছেন তাদের সংখ্যা নির্ণয় কার সু-কঠিন। তবে তাঁদের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে অনুমান করা হয়।[৪৬]

আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য

বড়পির (র.)-এর মজলিশে সর্বদা উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াতকারী দু'জন ক্বারি থাকতেন। তাঁরা কুরআন শরিফ পাঠ করতেন। তাঁর কোন মজলিশই এমন ছিল না, যাতে কোন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেনি। চোর-ডাকাত, হত্যাকারী, ফাসেক, গুনাহগার মূলহেদ এবং খারাপ এ'তেকাদের লোকদের এক বিরাট জামাত প্রতি মজলিসে তাঁর হাতে তওবা করে ইসলামের সত্য, সুন্দর ও সরল পথের অনুসারী হয়ে নিজেকে ধন্য ও সফল করে নিত।

জনৈক নাসারা দরবেশের ইসলাম গ্রহণ

একবার সেনান নামক জনৈক খ্রিষ্টান দরবেশ বড়পির (র.)-এর খেদমতে এসে তাঁর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "আমি

ইয়ামেনের অধিবাসী, আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ জন্মিল, তাই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। আমি ইচ্ছা করলাম যে, ইয়ামেন বাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার এবং দ্বিনদার হবে, আমি তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করব। এ কল্পনা করতে করতে আমি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম হযরত ঈসা (আ.) তাশরিফ এনে আমাকে বলছেন, তুমি বাগদাদ চলে যাও, সেখানে শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর হাতে ইসলাম কবুল কর। এখন ভূপৃষ্ঠে তিনিই সর্বোত্তম মানুষ।”

মাওলানা নুরুর রহমান শায়খ কেয়ানি (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, একবার তের জন খ্রিষ্টান বড়পির (র.)-এর মজলিশে এসে তাঁর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করল। তারা বর্ণনা করেছেন-“আমরা তের জন আরব দেশীয় খ্রিষ্টান, মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম না কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব। এমন সময় গায়েব হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, ‘তোমরা বাগদাদ চলে যাও এবং শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ কর।’ অতঃপর আমরা বাগদাদে এসে হাযির হলাম এবং শায়খের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম।”[৪৭]

একদা বড়পির (র.) বাগদাদের জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় পুত্র আবদুর রায্যাক (র.) মিম্বরের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি মাথা তুলে আসমানের দিকে দৃষ্টি করলে তৎক্ষণাৎ তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। বড়পির (র.) মিম্বর হতে নিচে নেমে এসে তাঁর হুশ ফিরিয়ে আনলেন এবং সাবধান করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, “আমি আবদুর রায্যাককে (রঃ)-কে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি দেখলাম শুন্যমণ্ডলের ওপর গায়েবি জগতের বহু ফেরেশতা আতশি পোশাক পরিধান করে এত অধিক সংখ্যক একত্রিত হয়েছেন যে, গৃহের সমস্ত আঙ্গিনা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সকলেই অবনত মস্তকে দন্ডায়মান হয়ে হযরতের ওয়াজ শুনছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ

বায়ুমণ্ডলের ওপর উচ্চস্বরে ধ্বনি করে উড়ে বেড়াচ্ছেন, কেউবা যবেহকৃত মুরগীর ন্যায় মাটিতে পড়ে ছটফট করেছেন। এ অবস্থা অবলোকন করে আমি বেহুশ হয়ে পড়লাম। হযরত শায়খ আমার ওপর তাওয়াজ্জুহ প্রদান না করলে আমি হয়ত মারাই যেতাম।”

হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর ফাসাহাত ও বালাগাতের খ্যাতি বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে বাগদাদের ফকিহ্ আলেমগণের মধ্য হতে একশ' জন ফকিহ্ একত্রিত হয়ে হযরত শায়খের মজলিশে আগমন করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেকে এক একটি কঠিন ও জটিল মাসআলা জিজ্ঞেস করে শায়খকে নিরুত্তর করে দেয়া। কিন্তু বড়পির (র.) তাঁদের মনের গুপ্ত কথা তাঁদেরকে দেখেই মুরাকাবা ও কাশ্ফ দ্বারা অবগত হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর নূরের ভাণ্ডার হতে নূরের এক ঝলক বের হয়ে তাঁদের সকলকে বেষ্টন করে ফেলেছে। নূর দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার পরে তাঁরা সকলে বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং সবকিছু ভুলে গেলেন। তাঁরা কন্নাকাটি করতে করতে পরিধানের বস্ত্র ছিড়তে লাগলেন। একে একে সকলে মিম্বরে উঠে শায়খের পায়ের ওপর পড়তে লাগলেন। তাঁদের কান্নাকাটি, চিৎকার ও শোরগোলের অবস্থা এমন হল যে, যেন ভুমিকম্প আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের এ অবস্থা দেখে শায়খ নিতান্ত আদরের সাথে সকলকে কোলে টেনে নিলেন এবং আলিঙ্গন করে বললেন, 'ইহা তোমাদের প্রশ্ন সমূহের উত্তর। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ মুসাব্বিবুল আসবাব।'

বড়পির (র.)-এর মারেফাত সম্পর্কিত বিষয়াবলীর বক্তৃতা এমন প্রভাব বিস্তারকারী ও ক্রিয়াশীল ছিল যে, তাতে আল্লাহ প্রেমিকদের তপ্ত অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেত। ফলে পরম স্বত্ত্বার মিলনের আনন্দে অনেকেই শহিদ হয়ে যেত। সভার শেষে ধরাশায়ীদের অবস্থা দেখে আল্লাহ্ প্রেমিকদের মৃতের সংখ্যা সনাক্ত করা হত। তাঁর ওয়াজ মাহফিলে এধরনের ঘটনা হর-হামেসা ঘটত।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) নির্জন পরিবেশে আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করতে বেশি ভালবাসতেন। এ অভিপ্রায়ে সর্বদা একাগ্রচিত্তে মহাপ্রভুর স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ছিল এর বিপরীত। আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা হল তাঁকে কুতুবুল আকতাবরূপে কঠিন দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে নির্জনতার বেড়াজাল হতে মুক্ত করে প্রকাশ্যে কর্মমুখী জীবনমঞ্চে পৌঁছে দেয়া। পথহারা মানুষকে সঠিক পথে আনা, পার্থিব লালসায় মত্ত লোকদের মোহ ভাঙ্গানো, শয়তানের প্ররোচনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীদের বন্ধন মুক্ত করা, স্বার্থপর লোকদের নিঃস্বার্থ করে গড়ে তোলা, আল্লাহর ইবাদতে গাফেলদের ইবাদতের স্বাদোপলব্ধি করানো, শিরক-বিদআতে লিপ্তদের তাওহিদের শুধা পান করানো এবং সমুদয় মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া। এতদোদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁকে রুহানি শক্তি দানের সাথে সাথে প্রচার ও বক্তৃতা দানের সর্বপ্রকার গুণাবলী প্রদান করলেন। আর তিনিও প্রভূ প্রদত্ত গুণাবলীসমূহ সর্বোতভাবে স্বীয় বক্তৃতায় প্রয়োগ করতে লাগলেন। তদুপরি তাঁর ওয়াজসমূহে নিজস্ব কোন স্বার্থসিদ্ধি বা উদ্দেশ্য সাধনের সামান্যতম লক্ষ্যও ছিল না। তাঁর বক্তৃতা দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মহাপ্রভূ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশাবলী ও ইচ্ছা সমূহ সকলের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এ ব্যাপারে তিনি চালিত হতেন আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী। এতে তাঁর নিজস্ব কোন শক্তি বা ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ ছিল না। মোট কথা তাঁর ওয়াজ করার অভাবনীয় যোগ্যতা, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সবকিছুই আল্লাহ তা'|য়ালার দান, রহমত এবং ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

যাহেরি ও বাতেনি ইলমের পার্থক্য

বড়পির (র.) এর সুযোগ্য জৈষ্ঠ্য পুত্র হযরত আবু আবদুল্লাহ ইসলামের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বহুমূখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সবে মাত্র দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

একদিন এক মাহফিলে পিতা-পুত্র উভয়ই উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল ছিল লোকে লোকারণ্য। বিশাল সমাবেশে জনতা নিশ্চুপভাবে বড়পির (র.) এর ওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষমান ছিল। প্রথমে শায়খ আবু আবদিল্লাদ আবদুল ওয়াহ্হাব বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অতি সুন্দর বাক্য বিন্যাসে, মধুর বচনে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের বক্তৃতা প্রদান করলেন। কিন্তু তাঁর এমন সুন্দর বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ক্রমে শ্রোতাদের মধ্যে আনমনা ভাব দেখা দিচ্ছিল। শায়খ আবু আবদুল্লাহ শ্রোতাদের অবস্থা উপলব্ধি করে বক্তৃতা বন্ধ করে বসে পড়লেন।

হযরত আবু আবদুল্লাহ স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, অতঃপর আমার বযুর্গ পিতা নিজে বক্তৃতা আরম্ভ করে বলতে লাগলেন, "গতকাল আমি রোযা রেখেছিলাম, উম্মে ইয়াহইয়া কয়েকটি ডিম রান্না করে একটি নতুন মাটির পাত্রে করে তাকের ওপর রেখে দিয়েছিল। একটি বিড়াল এসে পাত্রটি ফেলে দিলে তা ভেঙ্গে যায়। সুখাদ্য ডিম কয়টি মাটিতে পড়ে ধুলি বিজড়িত হয়ে যায়।" আবদুল কাদির জিলানি (র.)-এর এ সাধারণ কয়টি বাক্য শুনে শ্রোতাদের হৃদয় নতুন ভাবের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সমগ্র মাহফিল জুড়ে আল্লাহপ্রেমিকদের মাঝে হা-হুতাশ ও ক্রন্দনের রোল শুরু হয়ে গেল।

সভার কাজ শেষ করে হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) তাঁর পুত্রকে নির্জনে ডেকে বললেন, বৎস! তোমার জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। অথচ আমার সাধারণ কয়েকটি কথা তাদের মনে এত আলোড়ন সৃষ্টি করল যে, তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এর কারণ কী তুমি বুঝতে পেরেছ?

শায়খ আবু আবদুল্লাহ (র.) বললেন, আব্বাজান, আমার পক্ষে তা বুঝা মুশকিল। অনুগ্রহ করে আপনি বলে দিন।

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) বললেন, তবে শ্রবণ কর, বৎস! তুমি তোমার ইলম ও দেশ ভ্রমণের জন্য গর্বিত। কিন্তু রুহানি জগতে তুমি ভ্রমণ করনি। অর্থাৎ যাহেরি ইলমে তুমি পণ্ডিত কিন্তু রুহানি ইলমের অভাবজনিত কারণে তোমার কথার মধ্যে আল্লাহর নূর বিকশিত হয় না। আর আমি যখন কথা বলি তখন আল্লাহর নূর (জ্যোতি) বিকশিত হয়। কারণ আমি নিজেকে বিলীন করতঃ গূঢ়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে বক্তব্য রাখি। পক্ষান্তরে তুমি স্বীয় সত্ত্বার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বল, যে কারণে তোমার কথা শ্রোতামণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না।

মূলতঃ হযরত বড়পির (র.)-এর বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে রান্না করা ডিম, মাটির পাত্র এবং বিড়ালের দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ অবতারণা করা হলেও এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে নফসে আম্মারা তথা প্রবৃত্তি ও শয়তানের দিকে। বিবেক সম্পন্ন লোক ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পেরে করুণ আর্তনাদ করে উঠেছিল। আর অজ্ঞ ও সাধারণ শ্রোতাগণের হৃদয় প্রাঞ্জলতা, সারল্য ও সাধারণ বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বড়পির (র.)-এর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে কমিয়ে দিয়েছে পথের দূরত্ব, বক্তার স্বর উচ্চ করার জন্য আবিস্কৃত হয়েছে লাউড স্পিকার। রেডিওর সাহায্যে এক স্থানের কণ্ঠস্বর অন্য স্থানে প্রেরণ করা ও শোনা সম্ভবপর হয়েছে। আর টেলিভিশনের সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানের বক্তৃতা একই সাথে শোনাও যাচ্ছে এবং বক্তাকে দেখাও যাচ্ছে। তৎকালে এটা ছিল অকল্পনীয়। সে যুগে আবদুল কাদের জিলানি (র.) লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ভাষণ দান করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত বড় বিশাল জনসমুদ্রের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকজন সমভাবে স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে শ্রবণ করতে পারত।

এরূপ আশ্চর্যজনক ঘটনার পেছনে কেবল বড়পির (র.)-এর অকল্পনীয় রুহানি ও আধ্যাত্মিক শক্তিই যান্ত্রিক শক্তি হতে অধিক শক্তিশালী ও কার্যকরী ছিল।

বিদেশে বসে বক্তৃতা শ্রবণ

আধ্যাত্মিক সাধনায় যারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি সাধারণ মানুষের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। সুফি-সাধকগণ তাঁদের সাধনা বলে এমন সব স্বাভাবিক ও অলৌকিক কাজ করতে পারেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে কোন কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও তাকে অসম্ভব বা অবাস্তব বলা সংগত হবে না। কারণ, বর্তমানে অসম্ভব এমনকি ধারণাতীত কার্যসমূহও বিজ্ঞানের যুগে পার্থিব শক্তির সাহায্যে বশে এনে এমন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর অলি-আউলিয়াগণ এ ধরণের কাজ ইচ্ছা করলেই সাধন করতে পারতেন। এ কাজ করা তাঁদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিলনা কারণ, তাঁদের জাগতিক শক্তির তুলনায় রুহানি সক্ষমতা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। হযরত বড়পির (র.) তাঁর অপরিসীম রুহানি শক্তি বলে নিজের মুখনিসৃঃত বাণী সমূহ অনেক সময় দূর দেশে অবস্থানকারী ভক্তদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, তেমনি আবার সেই সুযোগ্য ভক্তগণ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ঐ বাণী সমূহকে গ্রহণ করে নিতেন। তবে রুহানি বা আধ্যাত্মিক শক্তিহীন লোকের পক্ষে তা আদৌও সম্ভব নয়। সে জন্য বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর কণ্ঠস্বর দূর-দেশে ভেসে আসলেও তা গ্রহণ করার শক্তি যাদের ছিল না; তাঁরা সে কণ্ঠস্বরের আওয়াজ শুনতে পেত না। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা আমাদের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে,

বর্ণিত আছে, হযরত বড়পির (র.)-এর জনৈক ভক্ত হযরত আদি ইবন মুসাফির (র.) বাগদাদ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। সময় ও সুযোগের অভাবে তিনি হযরত

বড়পির (র.)-এর সকল মাহফিলে যোগদান করতে পারতেন না। কিন্তু দৈব বলে সুদূর বাগদাদবাসী হযরত বড়পির (র.)-এর বক্তৃতা প্রদানের তারিখ ও সময় তাঁর জানা থাকত। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তবৃন্দসহ একটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতেন এবং সেখানে লাঠি দ্বারা একটি বৃত্তরেখা টেনে তার মধ্যে সকলকে নিয়ে বসে যেতেন। ওদিকে হযরত বড়পির (র.)-এর বক্তৃতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বক্তৃতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুরু করত। তিনি সঙ্গিগণসহ অত্যন্ত স্পষ্ট আওয়াজে তা শুনতে পেতেন। এ বক্তৃতা সমূহ শুনে সাথে সাথে তিনি সেগুলো লিখে রাখতেন। সভাস্থলে বসে যারা বক্তৃতা লিখতেন, পরে তাঁদের সে লেখার সাথে আদি ইবন মুসাফির (র.)-এর লেখা বক্তৃতা মিলিয়ে দেখা গেছে তাতে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো সম্ভব হয় শুধু রুহানি বা আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা।

আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার সাথে অন্যান্য সাধক, দরবেশ ও আল্লাহপ্রেমিকদের প্রচার কার্যের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও প্রচার কার্যের সাথে বিস্তর পার্থক্য ছিল। তিনি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য বাস্তব, সমাজধর্মী ও সঠিক পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ কথা বলা চলে যে, অন্যান্য অলিগণ এ ব্যাপারে যে সকল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তিনি তাঁর সবগুলোকে গ্রহণ করে সর্বতোভাবে ব্যাপক আকারে মানবের হিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি ওয়াজ-নসিহত, গ্রন্থ রচনা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র ও কারামাত ইত্যাদি সকল কিছুর সামগ্রিক প্রচেষ্টার দ্বারা বিপথগামীদেরকে আল্লাহর পথে আনার জন্য দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন মতের দিশারীদের অভিমতগুলো গ্রহণ করে এমন উন্নত সর্বজনগ্রাহ্য অভিমত প্রচার করতেন যা সকলের জন্য গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হত।

তাঁর বক্তৃতাবলী ইসলামের অনুসারীদের জন্য চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সম্পদ। সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁর এ সকল মুখনিঃসৃত মহা মূল্যবান বক্তৃতাসমূহের দ্বারা কত মানুষের যে উপকার সাধিত হয়েছে, তার হিসেব বের করা খুবই কঠিন। তাঁর ওয়াজ মাহফিলে হাজির থেকে প্রত্যক্ষভাবে যারা তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করে যেরূপ উপকৃত হয়েছেন তদ্রুপ অনুপস্থিত লোকগণও যেন যুগ যুগ ধরে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলো সাথে সাথে লিখে রাখা হয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁর বক্তৃতা সমূহ চারশত অভিজ্ঞ আলেম উপস্থিত থেকে সভাস্থলে বসে সেগুলো লিখে রাখতেন। হযরত শায়খ আফিফুদ্দিন ইবন মুবারক (র.) উপর্যুক্ত আলেমদের লেখা বক্তৃতা হতে বড়পির (র.)-এর বিভিন্ন সময় প্রদত্ত ৬২ খানা অমূল্য বক্তৃতা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। নিম্নে আমরা তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পেশ করছি-

সর্বপ্রথম ওয়াজ

হিজরি ৫৪৫ সনের ৩রা শাওয়াল রোজ রবিবার বাদ ফজর হযরত বড়পির (র.) স্বীয় খানকায় নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেন, 'তাকদিরের লিখন অবতীর্ণের পর অর্থাৎ তাকদিরের লিখন সংগঠিত হওয়ার পরে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তায়ালার কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করলে ধর্ম, তাওহীদ, তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, ইখলাস অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যায়। কামেল ইমানদারগণ কখনও তাকদিরের প্রতিবাদ করেন না; আল্লাহর তরফ হতে আগত বিপদকে কল্যাণকর মনে করে সন্তুষ্টচিত্তে বলেন, হ্যাঁ এরূপ হওয়াই সমীচীন ও কল্যাণকর ছিল। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির আকাঙ্খা পোষণ করে, তাঁর কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হবে যেন প্রবৃত্তি দ্বারা ক্ষতির আশংকা না থাকে। কেননা প্রবৃত্তি বড়ই দুষ্ট এবং অপকর্ম ও দুরন্তপনায় সিদ্ধহস্ত। কঠিন রিয়াযাত, সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা দুরন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল নাফস্ শান্ত হতে

আরম্ভ করলে এই নাফস্-ই আবার অশেষ মঙ্গলের উৎস হয়ে পড়ে। হৃদয়ে ইবাদত ও পাপ পরিত্যাগের আগ্রহ জন্মায়। তখন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে আনুগত্য ও সহযোগিতা করতে থাকে। মানুষ এরূপ অবস্থায় উপনিত হলে তাঁর প্রতি আল্লাহর আদেশ হয়, হে তৃপ্ত ও প্রশান্ত নাফ্স! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আস, এমন ভাবে যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তরিকতের এই পর্যায়ে উন্নীত হলে আল্লাহর প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা খাঁটি ও মজবুত হয় এবং নাফসের দিক হতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত মাখলুকাতের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তখন রুহানি পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম এর সাথে তাঁর সম্পর্ক পূর্ণ ও দৃঢ় হয়। কারণ তিনি নমরুদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলে সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলে ফেরেস্তাসহ নানা প্রকারের মাখলুক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ বিপদে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা করল। উত্তরে তিনি তাঁদেরকে বলেন, তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার সাহায্যের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তাঁরা আরজ করল, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক লক্ষ্য অবহিত আছেন। অতএব তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করারও প্রয়োজন নেই। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের আত্মসমর্পন এবং তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআলা অগ্নিকুণ্ডকে আদেশ দেন, হে অগ্নি! ইব্রাহিমের উপর শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও। মনে রেখ যে ব্যাক্তি ভাগ্যলিপিতে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিপদাপদে ধৈর্যাবলম্বন করে, তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অশেষ কল্যাণ ও সাহায্য এবং আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। যেমন

আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার ও বিনিময় প্রদান করা হবে।

যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিপদাপদে সবর করেন তাঁদের কোন বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর অজ্ঞাত থাকে না। যখন তুমি তাঁর অসীম দানসমূহ এবং অপার করুণা সারা জীবন পেয়ে আসছ, তখন তুমি ক্ষণিকের জন্য একটু সবর অবলম্বন কর না কেন? অল্প সময়ের জন্য একটু ধৈর্যাবলম্বন কর। অল্প সময়ের জন্য একটু ধৈর্যাবলম্বন করা বিরাট যোগ্যতার পরিচায়ক। যেন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথে আছেন। এর অর্থ এই যে আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাহায্য ও বিজয় দান করে থাকেন। অতএব ধৈর্যশীল হয়ে তাঁর সঙ্গী হয়ে থাক। তিনি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাক। কখনও অসতর্ক, উদাসীন ও অমনযোগী হয়ো না। মৃত্যুর পর সাবধান ও সতর্ক হওয়ার অপেক্ষায় থেকো না। তখন সতর্ক হলে কোন উপকার হবে না। মৃত্যুর পরে মহাপ্রভু আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য সজাগ ও সচেতন থাক। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়ার আগে এ দুনিয়াতেই মৃত্যুর উদ্দেশ্যে সজাগ ও সচেতন থাক। অন্যথায় তখন ভয়ানক অনুতপ্ত ও দগ্ধিভূত হতে হবে। কিন্তু সে অনুতাপ কোনই কাজে আসবে না। আর সময় থাকতে নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে নাও, কারণ তোমাদের অন্তর শুদ্ধ হলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এ মর্মে রাসুল (সা.) বলেন, আদম সন্তানদের দেহের মধ্যে একখানি মাংসপিন্ড রয়েছে। ঐ মাংসখণ্ড ঠিক থাকলে সমস্ত দেহ ঠিক থাকে। আর উহা খারাপ হয়ে গেলে সমস্ত দেহ খারাপ হয়ে যায়। তোমরা জেনে রেখো, এটাই মানুষের অন্তঃকরণ বা ক্বালব।

জেনে রাখ, খোদাভীতি, আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়াক্কুল, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, তাওহিদ তথা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং খাঁটি ও খালেস নিয়তে তাঁর

ইবাদত করার মাধ্যমেই অন্তঃকরণ ঠিক হয়ে থাকে। আত্মা এ সমস্ত গুণ হতে বঞ্চিত হলেই ক্বাল্ব বা অন্তঃকরণ বিগড়ে বা নষ্ট হয়ে যায়। দেহের ভিতর অন্তঃকরণ, কৌটার ভিতরে বহুমূল্য মণি-মুক্তা তুল্য ধনাগারের সম্পদের মত। জ্ঞানীদের দৃষ্টি ভিতরের মণি-মুক্তা ও ধন সম্পদের ওপরই নিবন্ধ থাকে, কৌটা বা ধনাগারের প্রতি নয়।

হে দয়াময় আল্লাহ! আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপনার ইবাদতে মশগুল রাখুন। জীবিত অবস্থায় আমরা যেন, অহর্নিশ তোমার ইবাদত সানন্দে একনিষ্ঠভাবে নিবিষ্ট থাকতে পারি, সে তাওফিক আমাদের দান করুন। আমাদের আত্মাকে আপনার মারেফাত ও ধ্যান-সাধনায় নিয়োজিত রাখুন। যে সমস্ত নেককার লোক ইহকাল ত্যাগ করে আপনার দরবারে চলে গেছেন আমাদেরকে তাঁদের দলভুক্ত করুন। তাঁদেরকে যা দান করেছেন, আমাদেরকেও তা দান করুন। আপনি তাঁদের জন্য যেমন হয়েছিলেন, আমাদের জন্যও তেমন হয়ে যান।

হে আমার শ্রোতামণ্ডলী! নেককার বান্দাগণ যেভাবে আল্লাহ তাআলার হয়ে গিয়েছেন, আপনারাও তদ্রুপ হয়ে যান। তাহলে মহান রাব্বুল আলামিন তাঁদের জন্য যেমন হয়ে গিয়েছেন, তোমাদের জন্যও তেমন হয়ে যাবেন। যদি এরূপ আশা পোষণ করেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের হয়ে যান। তাহলে তাঁর ইবাদত করুন। বিপদাপদে ধৈর্য হারা না হয়ে সবর অবলম্বন করুন। তাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁর পক্ষ হতে যে সকল কাজ আপনাদের ও অন্যদের প্রতি সম্পন্ন হয় তাতে কখনও অসন্তুষ্ট হবেন না। তাঁর ইচ্ছা ও বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আশেকে মাওলা ব্যক্তিগণ দুনিয়াকে বর্জন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্টন বিধানে তাঁদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাঁরা তা খোদাভীতি ও পরহেযগারির সাথে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তাঁরা পরকালের প্রতি অনুরক্ত ও উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন এবং

তদানুযায়ী আমল করে গিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় নাফসের বিরোধিতা করেছেন। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগিতে অটল ও অবিচল ভাবে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রথমে তাঁরা নিজেরা উপদেশ গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছেন, অতঃপর অপরকে উপদেশ ও হেদায়াতের কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

হে প্রিয় বৎস! প্রথমে নিজে উপদেশ দান কর। অতঃপর অপরকে উপদেশ দাও। তোমার পূর্ণ আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অন্যকে উপদেশ দানের চেষ্টা করো না। এতে তোমার আত্মশুদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটবে। কেবল নিজের নাফ্সের ইসলাহ্ কিভাবে হবে সে চিন্তায় মশগুল থাক। আফসোস! তুমি তো নিজেই ডুবে যাচ্ছ, অপরকে ডুবে যাওয়া হতে কেমন করে রক্ষা করবে? তুমি তো নিজেই অন্ধ, অপরকে কেমন করে পথ দেখাবে? কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই অপরকে পথ দেখাতে পারে। যে ভাল সাতারু, সেই কেবল পারে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে, তিনিই একমাত্র পারেন লোকদিগকে কুফরি ও নাফরমানি হতে ফিরিয়ে রেখে আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই আল্লাহ্ তাআলার মারেফাত অর্থাৎ পরিচয় জ্ঞান লাভ করেনি, সে কিভাবে অপরকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় জ্ঞান দান করবেন? যে ব্যক্তি নিজেই আল্লাহর সন্ধান প্রাপ্ত নয়, সে কিভাবে অপরকে আল্লাহর সন্ধান দান করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে না চেন এবং তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত না হও, যার ফলে তোমার সমস্ত ইবাদত আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন বস্তুর উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় না কর, একমাত্র তাঁরই ভয় তোমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যকে উপদেশ দান করা তোমার জন্য সমীচীন নয়। মুখের অনবরত উপদেশ কোন কাজে আসে না। বরং আল্লাহ প্রেমিকদের আন্তরিক উপদেশ অপরের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। আর এটা নির্জন ও নিরিবিলিতেই হয়ে থাকে, লোক সমাবেশে হয় না। যদি প্রকাশ্যে তাওহিদের কথা থাকে

এবং অভ্যন্তরে শিরক থাকে, তবে তাকেই বলে আসল মোনাফেকি, আফসোস! তুমি কেবল মুখে ধর্মভীরুতা প্রদর্শন করছ, কিন্তু তোমার হৃদয় পাপে নিমজ্জিত। রসনায় তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ, কিন্তু তোমার হৃদয় প্রতিবাদ করছে। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, হে আদম সন্তান! আমার পক্ষ থেকে সর্বদাই কল্যাণ সমূহ নাযিল হচ্ছে, আর তোমাদের পক্ষ থেকে সর্বদা তোমাদের পাপ ও কদর্যতা আমার দিকে আসছে।

যখন তুমি আল্লাহ তাআলার পরিচয় জ্ঞান লাভ করে তাঁর প্রতি আসক্ত হবে, তখন তোমার যাবতীয় ইবাদত বন্দেগি কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই হতে থাকবে। তাতে পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও মর্যাদার লিপ্সা, সরদারি, মতব্বরি, বেহেশত প্রভৃতি কোন বস্তুর উদ্দেশ্য হবে না। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতিত রাজা-বাদশা, রাজ-কর্মচারী, দোযখ প্রভৃতি বিষয়ে অন্য কারও ভয় তোমার মনে স্থান পাবে না। বরং একমাত্র তাঁরই ভয় তোমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। কেবলমাত্র তখনই অপরকে হেদায়ত বা উপদেশ প্রদান করা তোমার পক্ষে জায়েয হবে এবং সেই উপদেশ অপরের জন্য ফলপ্রসূও হবে। মুখের অনর্গল ও অনলবর্ষী ওয়াজ বা বক্তৃতায় কোন ফল হয় না। মুখের অনবরত উপদেশ কোন কাজে আসে না। বরং আল্লাহ প্রেমিকদের আন্তরিক উপদেশ অন্যের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। আর তা জনসভায় বা লোক সমাবেশে হয় না, বরং এটা নিরবে-নিভৃতেই হয়ে থাকে। যদি প্রকাশ্যে তাওহিদ এবং অন্তরে শিরক থাকে, তাহলে একেই বলে আসল মুনাফেকি। পরিতাপের বিষয়, তুমি শুধু মুখে পরহেযগারি ও ধর্মভীরুতা প্রকাশ করছ, কিন্তু তোমার হৃদয় ও মন পাপ-পঙ্কিলতায় নিমগ্ন। মুখে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ, কিন্তু তোমার মন প্রতিবাদ করছে। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার তরফ হতে তোমাদের ওপর অহরহ কল্যাণসমূহ নাজিল হচ্ছে। আর তোমাদের তরফ হতে সর্বদা তোমাদের পাপরাশি ও কদর্যতা আমার দিকে আসছে।

আফসোস তুমি নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে দাবী করছ, কিন্তু যদি তুমি যথার্থরূপে তাঁর খাঁটি বান্দা হতে, তবে তোমার শত্রুতা ও ভালবাসা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হত। পাকা ঈমানদার ব্যক্তি কখনও স্বীয় প্রবৃত্তি, শয়তান এবং কামনা-বাসনার গোলামি করে না। শয়তানের অনুসরণ করা তো দূরের কথা, শয়তান যে কে, তা জানার অবকাশও তাদের থাকে না। দুনিয়ার মোহ তাঁদেরকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, দুনিয়াকে কোন জিনিস বলেই মনে করেন না। বরং তাঁরা তুচ্ছ ও হীন দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অখেরাতের কামনায় নিমগ্ন থাকেন। অতঃপর পরকাল অর্জিত হলে, তাঁরা এটাও পরিত্যাগ করে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভে নিমগ্ন হন। বিশুদ্ধ ও খাঁটি মনে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কেবল তাঁর ইবাদত, জিকির ও ধ্যানে নিমগ্ন হন। কারণ তাঁরা আল্লাহর এ বাণী শ্রবণ করেছেন, তাঁদেরকে কেবল এ আদেশই করা হয়েছে যে, তাঁরা অন্য সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে খাঁটি নিয়তে, একাগ্র মনে কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে।

কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করো না। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। সকল কিছুর স্রষ্টা তিনিই, সকল কিছু তাঁরই হাতে। ওহে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট প্রার্থনাকারী! তোমার কি সামান্যতম বুদ্ধি নেই? এমন কোন বস্তু আছে কি, যা আল্লাহর ভাণ্ডারে নেই? পরম শক্তিমান আল্লাহ বলেন, এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই।

হে বৎস! ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পোশাক পরিধান কর। পরমানন্দ ও চরমৈশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদতে লিপ্ত হও। তাকদিররূপ নহরের গভীরতম তলদেশে নিমজ্জিত থাক। তাহলে তকদিরের নিয়ন্তা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য এমন অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও নেয়ামত নাযিল করবেন যার আকাঙ্ক্ষাও তুমি করতে সক্ষম হতে না।

হে লোক সকল! তোমরা অদৃষ্টের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আবদুল কাদেরের কথা শোন; সে তাকদিরের অনুকুল হওয়ার জন্য সচেষ্ট ও যত্নবান রয়েছে। তাকদিরের আনুকুল্য ও অনুগমনই আমাকে কাদেরের (মহাশক্তিশালীর) দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে।

হে প্রভু অন্বেষণকারীগণ! আস, আমরা মহান রবের আদেশ ও তাঁর অসীম ক্ষমতার সম্মুখে মাথা নত করি এবং মনে-প্রাণে তার নিকট আত্মসমর্পণ করি। আরও আস, আমরা তাকদিরের অনুকুল হই এবং তার অনুগামী থাকি। কারণ এটি অদৃশ্য বাদশাহের দূত। যে মহান ও প্রতাপশালী বাদশাহ এ দূত প্রেরণ করেছেন, তাঁর সম্মানার্থে এ দূতের সম্মান করি। আমরা যদি অদৃষ্ট বিধানের প্রতি এ ব্যবহার প্রদর্শন করি তাহলে অদৃষ্ট আমাদেরকে তাঁর প্রিয় সাথীরূপে আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, সেখানে সর্বময় হুকুমত ও কর্তৃত্ব একমাত্র পরম সত্য রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলারই থাকবে। আর কারও হুকুমত ও কর্তৃত্ব তথায় চলবে না। তোমার জন্য সু-সংবাদ এই যে, তুমি রবের মহাজ্ঞানের অপার সমুদ্রের পানি পান করবে। তাঁর অনুগ্রহের দস্তরখান হতে ভক্ষণ করবে। তাঁর প্রেমালাভে আনন্দিত হবে। তাঁর রহমতে পরিবেষ্টিত হয়ে অসীম ও অশেষ সুখ-শান্তি লাভ করবে। এরূপ মহাসৌভাগ্যবান মানব জাতির মধ্যে হাজারে দু'একজনের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

হে বৎস! পরহেযগারি অবলম্বন কর। শরিয়তের নির্ধারিত গণ্ডির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ। নাফ্সের প্ররোচনা, শয়তানের কুমন্ত্রনা এবং কুসংসর্গ হতে বিশেষ সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা কর। প্রকৃত মুমেন ব্যক্তি প্রতি মূহুর্তে নাফ্সের তাড়না, শয়তানের প্ররোচণা এবং অসৎ সঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। তাঁদের মাথা কখনও পাগড়ী শূণ্য হয় না, তাঁদের তরবারি কখনও কোষবদ্ধ হয় না এবং তাঁদের ঘোড়ার পিঠ কখনও গদি শূণ্য হয় না। নিদ্রা তাঁদেরকে একেবারে কাবু করে ফেললে কেবলই তাঁরা ক্ষণিকের জন্য শয্যা গ্রহণ

করেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হয়ে পড়লে তখনই তাঁরা কেবল সামান্য পরিমাণ আহার গ্রহণ করেন। একান্ত অত্যাবশ্যক না হলে তাঁরা বাক্যালাপ করেন না। নিরব থাকাই তাঁদের রীতি। নিশ্চুপ থাকাই তাঁদের স্বভাব। আল্লাহ তাআলার বিশেষ শক্তি কোন কোন সময় তাঁদেরকে কথা বলতে বাধ্য করে। আল্লাহ তাআলার আদেশই তাঁদেরকে মুখ সঞ্চালন করতে অনুপ্রাণিত করে। দরবেশগণের জিহ্বাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে পরিচালিত করেন, যেভাবে কেয়ামতের দিন মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করবেন। প্রতিটি বাকশীল প্রাণীকে যেভাবে তিনি বাকশক্তি প্রদান করেছেন, কেয়ামতের দিন এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও তিনি তেমনভাবে বাকশক্তি প্রদান করে তাদের দ্বারা কথা বলাবেন। যেরূপ তিনি কোন নির্জীব পদার্থকে বাকশক্তি প্রদান করবেন। অনুরূপ দরবেশগণকেও কথা বলার উপকরণাদি সংগ্রহ করে দেন। অতঃপর তাঁরা বলেন এবং জনগণকে উপদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁদের দ্বারা কোন কাজ করিয়ে নিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁদেরকে সে কাজের শক্তিও প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদিগকে আযাবের ভয় এবং রহমতের সু-সংবাদ প্রদান করতে ইচ্ছা করলে, নবিদেরকে সেরূপ বাকশক্তি প্রদান করেন। তাঁরা যুগে যুগে মানব সমাজে আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে আযাবের ভয় ও রহমতের সু-সংবাদ প্রদান করে গিয়েছেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁদেরকে মৃত্যুর মাধ্যমে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে যান, তখন নবি ও রাসুলগণের এলমানুযায়ী আমলকারি আলেমদেরকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁদের প্রতিনিধিরূপে ঐ সমস্ত আলেমগণের মুখ হতেও আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কেরামের মত এমন সব কথাই প্রকাশ করেন, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'আলেমগণ নবিদের উত্তরাধিকারী।'

হে লোকসকল! মহান আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আর এ সমস্ত নেয়ামত কেবল তাঁরই দান বলে মনে কর। এ মর্মে স্বয়ং বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (র.) বলেন, 'তোমাদের সাথে যত রকমের নেয়ামত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দান।' হে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত উপভোগকারীণ! কোথায় তোমাদের কৃতজ্ঞতা? হে আল্লাহ তাআলার দানকে মানুষের দান বলে ধারণাকারীগণ? তোমরা কখনো কখনো তাঁর নেয়ামতসমূহকে অন্যের নিকট হতে এসেছে বলে মনে করছ। আবার কোন কোন সময় উক্ত নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ। আর যে সকল নেয়ামত তোমরা এখনও প্রাপ্ত হওনি তার আশায় রয়েছ। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত নেয়ামত দ্বারা তাঁরই নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছ।

আবদুল কাদের জিলানি (র.) ওয়ায, শিক্ষাদান, ইবাদত, সাধনা আর ফতওয়া প্রদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ধর্ম সংক্রান্ত এবং প্রধানতঃ তাঁর ধর্মোপদেশ বা বক্তৃতাসম্বলিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. আল গুনিয়াতুত্তালেবিন তারিকিল হাক, এটি ধর্মানুষ্ঠান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ (কায়রো ১২৮৮ হি.)
২. আল ফাতহুর রাব্বানি, ৫৪৫-৫৪৬ হি./১১৫০/১১৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত ৬২ টি ধর্মোপদেশ, পরিশিষ্টসহ (কায়রো ১৩০২ হি.)
৩. ফুতুহুল গায়ব, বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত ও তাঁর পুত্র আবদুর রায্যাক কর্তৃক সংকলিত ৭৮ টি ধর্মোপদেশ; শেষভাগে তাঁর মৃত্যুকালীন অসিয়তনামা, পিতৃকুল ও মাতৃকুলে তাঁর বংশ বিবরণ, হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রমাণ ও তাঁর কয়েকটি কবিতা এ গ্রন্থে রয়েছে (কায়রো ১৩০৪ হি.)

৪. হিযবু বাশাইরিল খায়রাত, সুফি মতে প্রার্থনা (আলেকজান্দ্রিয়া ১৩০৪ হি.)

৫. যিয়াউল খাতির, ধর্মোপদেশ সংগ্রহ; এর প্রথমটি এবং ৫৯তমটির তারিখ একই এবং শেষটি ও ২য় পুস্তকের ৫৭তম নং পুস্তকের সাথে অভিন্ন, সম্ভবতঃ এটি একই পুস্তকের অপর নাম

৬. আল মাওয়াহিবুর রাহমানিয়াহ ওয়াল ফুতুহুর রাব্বানিয়াহ ফি মারাতিবিল আখলাকিস সানিয়া ওয়াল মাকামাতুল এরফানিয়াহ, এটি রাওযাতুল জান্নাতের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, সম্ভবতঃ ২ বা ৩ নং পুস্তকের সাথে অভিন্ন

৭. এয়াওয়াকিতুল হিকাম

৮. আল ফুয়ুদাতুর রাব্বানিয়াহ ফিল আওরাদিল কাদেরিয়াহ, প্রার্থনা সংগ্রহ (কায়রো ১৩০৩ হি.)

৯. বাহযাতুল আসরার ও অন্যান্য জীবন-চরিত বিষয়ক পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত ধর্মোপদেশ।

এই সব গ্রন্থে আবদুল কাদের জিলানি (র.) একজন সুযোগ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ এবং আগ্রহী, অকপট ও বাগ্মীপ্রবর প্রচারক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। বহু ধর্মোপদেশ তাঁর 'গুনয়াহ্'র অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাতে দশ ভাগে বিভক্ত ৭৩ টি ইসলামি ফেরকার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সময় সময় তিনি মুবাররাদ প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আল কুরআনের কয়েকটি গূঢ়ার্থবোধক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কতকগুলি যিকর ৫০ বা ১০০ বার পড়ার সুপারিশও এতে করা হয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তকের ধর্মোপদেশগুলো মুসলিম সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পদ। এগুলোর মর্মবাণী হচ্ছে দান-খয়রাত ও বিশ্বপ্রেম। তাঁর বক্তৃতায় সুফি পরিভাষার ব্যবহার নিতান্ত বিরল, সাধারণ শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হবে এমন একটি শব্দও নেই; বক্তৃতাগুলোর সাধারণ আলোচ্য বিষয় হল কিছুকাল যুহ্দ অর্থাৎ ত্যাগব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা, এই সময়ের মধ্যে সাধক যেন নিজেকে পৃথিবীর

আসক্তি মুক্ত করতে পারে, তৎপর সংসারে প্রত্যাবর্তন করে বিষয় ভোগ ও অন্যান্যকে দীক্ষা দান করতে পারে। ইহকালের পুরস্কারই হোক আর পারলৌকিক পুরস্কারই হোক, প্রত্যেকটি বস্তুই হচ্ছে সাধক ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা এবং সাধকের চিন্তা কেবল আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত-এই সুফি মতবাদও তাঁর লেখার একটি প্রধান প্রসঙ্গ; এমনকি নিজেদের পরিজনকে বাদ দিয়েও দরবেশদিগকে দান করার জন্য শ্রোতাদের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। বক্তা নিজের কথা খুব কমই বলেছেন এবং তাও খুবই সংযতভাবে। তিনি নিজেকে পৃথিবীর লোকের স্পর্শমণি বলেছেন, অর্থ তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কে উদাসীন, কে সমুৎসুক তিনি পৃথক করতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি জোরের সাথে দাবী করেন যে, কেবল আল্লাহর অনুমতি লাভের পরেই তিনি বক্তৃতা করেন।[৪৮]

জীবনের শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) দিবাভাগে খুতবা ও ফতোয়া দেওয়ায় ব্যস্ত থাকতেন এবং সারারাত ইবাদতেই মশগুল থাকতেন। পাঁচদিন ব্যতিত তিনি সারা বছরই রোযা রাখতেন এবং মাগরিবের পর একবার মাত্র খানায় বসতেন স্থানীয় ভিখারি ও দুঃস্থদের সঙ্গে নিয়ে। এভাবে মানুষের ও আল্লাহর অনন্য মনে সেবা করে প্রায় একানব্বই বছর বয়সে ৫৬১ হিজরির এগারোই রবিউস্‌সানিতে তিনি জান্নাতবাসী হন (১১৬৫ খিস্টাব্দ)। আজও তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত মধ্য এশিয়া, ইরান ও ইন্দো-পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী ‘ফাতেহা-ই-ইয়যদাহম’ বেশ শান-শওকতের সঙ্গে প্রতিপালন করে।

জিলানির ওফাতের পর তাঁর মুরিদান বা ভক্তকুল ‘ক্বাদেরিয়া তরিকা’ নামে কথিত হয় আর খুতবা ও বাণীগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট সংগ্রহ হচ্ছে ‘ফতুহুল গায়েব’ বা দৈবের বাণী। তা ছাড়া ‘ফাতাহান রাব্বানি’ নামে আর একটি খুতবা সংগ্রহ এবং ‘কাসিদাতুল গাওসিয়া’ নামক কবিতা সংগ্রহ তাঁর বাণী ও উপদেশাবলী আজো বহন করছে।

তথ্যসূত্র :

১. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৪

২. ইবনুল আরাবি স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সুফি দার্শনিক। তাঁর পুরা নাম শায়খুল আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি ওরফে মোহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে মোহাম্মদ আল আরাবি ইবনে আহামদ ইবনে আবদুল্লাহ। অনেক সময় তাঁকে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আলি মহিউদ্দিন আল হাতেমি আল আন্দালুসি ওরফে ইবনে আরাবি বলা হয়। পাশ্চাত্য জগতে তিনি ইবনুল আরাবি এবং স্পেনে ইবনে সুরাকা নামে পরিচিত। তিনি ২৯ জুলাই ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে (৫৬০ হিজরী) সুফি মতবাদে অনুধ্যান পরায়ণ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে / ৬৩৮ হিজরীর ২৮ শে রবিউস্‌সানি জুমারাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে 'আল কিবরিত আল আহমার' নামক স্থানে সমাহিত হয়। সুফি সাধনায় তিনি এত উন্নত হন যে তাঁর ভক্তেরা তাঁকে 'শায়খুল আকবর' বা শ্রেষ্ঠ শায়খ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুইশত উননব্বই বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল ফতুহাতুল মক্কিয়া' বা মক্কার প্রত্যাদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইবনুল আরাবি সুফি মতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। (সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, (বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৮৪) পৃষ্ঠা-২৮, ৩০, ৪৫

৩. 'কুতুব' শব্দের ধাতুগত অর্থ হলো পৃথিবীর বিভেদ-বিন্দু এবং সুফিমতে এই শব্দের তাৎপর্য হলো যাঁর অনন্যসাধারণ সাধনা-আরাধনায় ও চির-সজাগ দৃষ্টিপাতে একটা জাতির জীবন সুসংস্কৃত, রূপায়িত ও সার্থক হয়ে ওঠে। (*মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১১৪)

৪. রহমান, নূরুর, *গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে, ২০০০, পৃষ্ঠা-১১

৫. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৪, ১৪৫

৬. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

৭. চৌধুরী, মোঃ রাশেদ, *বড় পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)*, সাদনান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৯, ২০

৮. ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল, *হযরত গাউসুল আযমের অমরবাণী*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-২

৯. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩, ১৪

১০. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৫

১১. ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২, রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮, ফজল, এম. শাহজাহান বিন, *বড় পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর জীবনী ও আশ্চর্য কেরামত*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৪, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭

১২. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১

১৪. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯

১৫. ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩, ৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪

১৭. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭

১৮. ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪, ৫

১৯. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৫, ১৪৬

২০. ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

২২. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩

২৩. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫, ৪৬

২৪. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫, ৫০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩, ৫৪

২৬. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৬

২৭. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯, ৩০
২৮. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৬
২৯. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২, ৬৩
৩০. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭, ৭৮
৩১. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪
৩২. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯, ৯০
৩৩. বিন ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭
৩৪. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৬
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮, ২৭৯
৩৬. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৭
৩৭. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৯
৩৮. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭
৩৯. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৭
৪০. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮
৪১. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৯
৪২. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৯
৪৩. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯১
৪৪.রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭২, ৭৩ ও ৭৪
৪৫. ফজল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭, ৮৮
৪৬.রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭
৪৭.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১
৪৮.ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৪৯২, ৪৯৩।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্বাদেরিয়া তরিকা : উৎপত্তি, প্রসার ও পালন-পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়

ক্বাদেরিয়া তরিকা : উৎপত্তি, প্রসার ও পালন-পদ্ধতি

হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (র.) ঐতিহাসিক ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একাধারে এই তরিকার শ্রেষ্ঠ কুতুব ও ইমাম। তাঁকে গাউসুল আযম, মুহিউদ্দিন ইত্যাদি নানা অভিধায় ভূষিত করা হয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে 'বড়পির' বলে অভিহিত করে থাকেন। পারস্যের জিলান বা গিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী এই মহাপুরুষ স্বীয় জন্মভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে পবিত্র কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, মানতিক, তাসাউফ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হাম্বলি মাযহাবের একজন সুবিখ্যাত আলেম হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি অগণিত কারামত তথা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কামেল অলি ছিলেন। বহু সংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তিনি পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বি আলেম, বিখ্যাত বাগ্মী, পবিত্রচেতা মহাপুরুষ ও অসাধারণ শক্তিশালী সুফি-সাধক ছিলেন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হতে বড়পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) পর্যন্ত পিরানে পিরগণের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপঃ

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)

২. হযরত আলি (রা.)

৩. হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)

৪. হযরত ইমাম যাইনুল আবেদিন (র.)

৫. হযরত ইমাম বাকের (র.)

৬. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.)

৭. হযরত ইমাম মুসা কাযিম (র.)

৮. হযরত ইমাম আলি রেযা (র.)

৯. হযরত শায়খ মারুফ আল খারকি (র.)

১০. হযরত আবুল হোসেন সিররি আল সিকতি (র.)

১১. হযরত জুনায়েদ আল বাগদাদি (র.)

১২. হযরত আবু বকর আল শিবলি (র.)

১৩. হযরত আবদুল আজিজ বিন হারিস (র.)

১৪. হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহেদ তামিমি (র.)

১৫. হযরত শায়খ আবুল হোসেন কুরায়শি (র.)

১৬. হযরত শায়খ আবু সাইদ মুবারক মুখাররিমি মাখযুনি (র.)

১৭. হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.)।

ক্বাদেরিয়া তরিকার অনুসারীগণের মতে, প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কালেমা তাইয়্যেবাহর তালিম হযরত আলি (রা.) কে প্রদান করেন এবং তিনি এই তালিম তদীয় খলিফা হযরত হাসান আল বসরি (র.) এর নিকট আসে। এতদিন এই তালিম সিনায় সিনায় গুপ্তভাবে এসেছিল। কিন্তু গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এই তালিমকে সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং গুপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে তাঁর বিশেষ অনুসারীগণকে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত এই তরিকার অন্যান্য নিয়ম-কানুনও তিনি সুসংবদ্ধ করেন।

ক্বাদেরিয়া তরিকা ও তার শাখা-প্রশাখা ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আরব, মরক্কো, মিসর প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

ক্বাদেরিয়া তরিকার নিস্‌বত (সম্বন্ধ) একই উৎস থেকে তিন ধারায় বিকশিত হতে হতে গাউসুল আযম আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (র.) পর্যন্ত এসে ক্বাদেরিয়া তরিকা নামে সমন্বিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। তিনটি ধারার প্রথমটি সাইয়েদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, নুরে মুজাস্‌সাম হযরত মোহাম্মদ (সা.) থেকে হযরত আলি কাররমাল্লাহু ওয়াজহাহু লাভ করেন। তাঁর থেকে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) প্রাপ্ত হন, তাঁর থেকে হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং সাহেবজাদা হযরত হাসান মুসান্না (রা.)। এই ধারাবাহিকতায় পরম্পরাগতভাবে হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুসা জঙ্গি (র.) এর সাহেবজাদা গাউসুল আযম আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর প্রাপ্তি ঘটে।

ক্বাদেরিয়া তরিকার দ্বিতীয় ধারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে পরম্পরাগতভাবে হযরত সালমান ফারসি (রা.) হয়ে হযরত সর্‌রি সাক্‌তি (র.) পর্যন্ত পৌঁছে। এমনি ভাবে তা এগোতে এগোতে হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (র.) পর্যন্ত এসে পৌঁছে। এখান থেকে হযরত শায়খ আবু বকর শিবলি (র.) লাভ করেন। তাঁর থেকে ক্রমধারায় শায়খ আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ ইয়ামানি লাভ করেন। এমনি ভাবে এই সিদ্দিকি নিসবত হযরত আবু সাঈদ মাখরুমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে প্রাপ্ত হন গাউসুল আযম আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানি (রাহ.)। এই তরিকার ৩য় ধারা হযরত খিযির আলায়হিস সালামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গাউসুল আযম (র.)। এই তৃতীয় ধারার নিসবতও লাভ করেন। এই তিনটি নিসবত একত্র হয়ে ক্বাদেরিয়া তরিকার উন্মেষ ঘটে।[১]

ক্বাদেরিয়া তরিকার অনুসারীগণের মতে, প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কালেমা তাইয়্যেবাহর তালিম হযরত আলি (রা.) কে প্রদান করেন এবং তিনি এই তালিম তদীয়

খলিফা হযরত হাসান আল বসরি (র.) এর নিকট আসে। এতদিন এই তালিম সিনায় সিনায় গুপ্তভাবে এসেছিল। কিন্তু গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এই তালিমকে সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং গুপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে তাঁর বিশেষ অনুসারীগণকে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত এই তরিকার অন্যান্য নিয়ম-কানুনও তিনি সুসংবদ্ধ করেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর নিকট হতে কোন মুরিদের খেরকা গ্রহণের অর্থ হলো তাঁর ইচ্ছা বা বাসনা শায়খের ইচ্ছা বা বাসনার তাবেদার হয়েছে। অর্থাৎ শায়খের কাছে বায়আতের পর শিষ্যের আর কোন পৃথক বাসনা থাকে না। আবদুল কাদের জিলানি (র.) কর্তৃক খেরকা প্রাপ্ত খলিফাগণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত। অবশ্য শায়খ ঘোষনা করেছিলেন, খেরকা ধারণের বিষয়টি তাঁর তরিকাভুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক নয়। বরং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত নিষ্ঠাই যথেষ্ট।

শায়খ জিলানি (র.) এর জীবদ্দশাতেই কিছু বরেণ্য লোক তাঁর তরিকার প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন:

১. আলি ইবনুল হাদ্দাদ, যিনি ইয়ামেনে;

২. মুহাম্মদ আল বাতায়হি, যিনি সিরিয়ায়;

৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদিস সামাদ, যিনি মিসরে হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর তরিকার প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করেন এবং মুদি ও শিষ্য সংগ্রহে নিয়োজিত হন। বালবেকের অধিবাসী তাকিয়ুদ্দিন মুহাম্মদ আল ইউনানিও ছিলেন শায়খ জিলানির তরিকার অন্যতম একজন প্রচারক।

ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রচার-প্রসারে আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর পুত্রদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এমনকি শায়খের জীবদ্দশাতেই তাঁর কোন কোন পুত্র মরক্কো, মিসর, আরব, তুর্কিস্তান ও ভারতে তাঁর তরিকা প্রচার করেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

মরক্কো, তিউনিসিয়া ও লিবিয়া তথা উত্তর আফ্রিকার বারবার জাতি অধ্যুষিত দেশসমূহে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে ক্বাদেরিয়া তরিকার অস্তিত্ব ছিল এবং ফাতেমিয়দের (৫৬৭/১১৭১ সনে অবসান) সাথে এই তরিকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। ক্বাদেরিয়া তরিকা উত্তর আফ্রিকায় জিলালি বা জিলানি নামে অভিহিত ছিল। আর যারা এই তরিকা অনুসরন করতেন তারা জিলালা নামে অভিহিত হতেন।

ক্বাদেরিয়া তরিকা ও এর সুফিতাত্ত্বিক বিষয়াদি একেবারে সূচনাকালের দিক হতেই বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) একটি বিখ্যাত তরিকার প্রতিষ্ঠাতা আর ঐ তরিকার নানা রীতি বা আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে কিংবা তিনি নিজেও অনেক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিয়েছেন-এরকম ধারণা ও বিশ্বাসও আমাদের সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বলা চলে, তাঁকে অনেক কারামতের অধিকারী বলে যে ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে, তা তাঁকে নিঃসন্দেহে অতিমানবীয় পর্যায়ে উন্নীত করে। ইবনুল আরাবির মতে, শায়খ অনেক কারামতের অধিকারী ছিলেন, আর তা তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি সংঘটিত করেছেন; মৃত্যুর পরে নয়।

সাধারণতঃ ক্বাদেরিয়া বলতে যে তরিকা এর সাথে প্রযুক্ত হয়, তার সাথে অন্যান্য তরিকার পার্থক্য প্রধানতঃ এর আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতিতে। এই তরিকার উৎপত্তিগত নানা পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য সুফি মতবাদসমূহের নানান নিয়ম-কানুনে যে কড়াকড়ি, ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখা যায় তা এই তরিকায় নেই। ক্বাদেরিয়া তরিকা বহির্ভূত গোষ্ঠীগুলো তাই কার্যত এক একটি ক্ষুদ্র ও একান্ত রক্ষণশীল ধর্মীয় ব্যবস্থা বিশেষ যার চৌহদ্দির বাইরে গেলে

মুক্তি নেই বলে মনে করা হয়। এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী হলেও এর মুরিদ সংখ্যা কেবলমাত্র এই মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ফলত এই তরিকা তাত্ত্বিকভাবে হলেও সহিষ্ণু ও উদার।[৩]

ইতিহাস ও ভূগোলের উপর লিখিত গ্রন্থগুলিতে মুসলিম ধর্মীয় সৌধগুলির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সৌধগুলির সাথে সম্পর্কিত তরিকার পার্থক্য নির্দেশ কচিত থাকায় ইরাকের বাইরে কোন্ দেশে প্রথম ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রচার-প্রসার সংক্রান্ত খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঠিক তারিখ সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর দুই পুত্র হযরত ইবরাহিম (মৃ. ৫৯২ হি./১১৯৬ খ্রি.) ও হযরত আবদুল আযিয (র.) এর বংশধরগণ ফেয-এ এই তরিকার প্রবর্তন করেন বলে কথিত রয়েছে। তাঁরা প্রথমে স্পেনে যান এবং গ্রানাডার পতনের (৮৯৭ হি./১৪৯২ খ্রি.) অল্পকাল আগে তাঁদের বংশধরগণ মরক্কোতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ফেয-এ ১১০৪ হি./১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে ক্বাদেরিয়া খালওয়ার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এশিয়া মাইনর ও ইস্তাম্বুলে এই তরিকার প্রবর্তন করেন ইসমাইল রুমি। তিনি তোপখানা এলাকায় কাদেরখানা নামে পরিচিত খানকাহ্রও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে পিরে সানি বা ২য় শায়খ নামে অভিহিত করা হয়। তিনি সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ৪০টি তাকিয়া স্থাপন করেন। সালেহ ইবনে মাহদি ১১৮০ হি./১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পবিত্র মক্কায় একটি কাদেরি রিবাত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে আবদুল কাদের জিলানি (র.) জীবিত থাকাবস্থায় পবিত্র মক্কায় ক্বাদেরিয়া তরিকার একটি শাখাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে যে দাবি করা হয় তাও অসম্ভব নয়; কেননা মক্কার প্রতি সুফিগণের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। আইনে আকবরি গ্রন্থে ক্বাদেরিয়া তরিকাকে একটি সম্মানী তরিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ তরিকাকে এতে ভারতে স্বীকৃত তরিকাসমূহের অন্তর্ভূক্ত করা

হয় নি। এছাড়া মাআসের-এ কেরাম (১৭৫২ খ্রি.) গ্রন্থে অপর কয়েকটি তরিকার উল্লেখ দৃষ্ট হলেও এতে প্রদত্ত ভারতীয় সুফিদের তালিকায় ক্বাদেরিয়া তরিকার কোন উল্লেখ নেই। অথচ শায়খ আবদুল কাদের (র.) এর নাম রয়েছে।

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সকল ইসলামি দেশেই ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। যদিও দেখা যায়, কতকগুলি বানোয়াট ক্বাদেরিয়া তরিকা বহু স্থানে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে আছে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে গিনির তৌবা অঞ্চলের কাদিরিবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। এই কাদেরিবাদ এমন একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যা বস্তুতপক্ষে গিনির Diakanke উপজাতি গোষ্ঠীর স্বকীয় পরিচয় প্রকাশক হয়ে উঠেছে। Sidia-এর মাধ্যমে তিমবাকতুর 'কৌনতা'য় প্রচলিত ক্বাদেরিয়া মতবাদ হতে তৌবা-এর কাদেরিবাদের উদ্ভব হয়েছে।[৪]

তুর্কি কাদেরিদের প্রতীক হচ্ছে সবুজ রঙের গোলাপ। এটি ইসমাইল রুমি নির্ধারণ করেন। যিনি তরিকার সদস্য হতে চান তাকে এক বছর পর একটি আরাকিয়া বা ছোট আকারের একটি ফেয জাতীয় টুপি নিয়ে উপস্থিত হতে হয়। অতঃপর তার ইচ্ছা মঞ্জুর হলে সংশ্লিষ্ট শায়খ ঐ টুপিতে ১৮ দলের একটি গোলাপ আটকিয়ে দেন যেই প্রতীকের মধ্যভাগে সুলায়মান নবির মোহর অঙ্কিত থাকে। 'তরিকার লোকেরা এই টুপিকে তাজ নামে অভিহিত করে। ব্রাউন-এর মতে, তুর্কি কাদেরিগণ সবুজ রঙের পক্ষপাতী হলেও অন্যদের ভিন্ন রঙেও তাদের আপত্তি ছিল না। মিসরে ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রায় সব সদস্যই ছিল মৎস্যজীবি পেশার লোক। তাঁরা ধর্মীয় মিছিলে বিভিন্ন পতাকা দণ্ডে বিভিন্ন রঙের মাছধরা জালের প্রতীক বহন করতেন। ১১ রবিউস্‌সানি তারিখে আবদুল কাদের জিলানির সম্মানে নানা অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং আলজেরিয়া ও মরক্কোর বহু স্থানের যাবিয়া ও দরবেশগণের মাযারে বহু লোক নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যিয়ারতে শরিক হন।

ক্বাদেরিয়া তরিকা মতে, যারা খালওয়া-তে প্রবেশ করতে উদ্যত তার প্রতি দিনে সাওম পালন ও রাতে জাগরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। খালওয়া স্থায়ী হয় ৪০ দিন। এই ৪০ দিন চলাকালে আহার ক্রমশ কমিয়ে এনে শেষের তিনদিন পরিপূর্ণ সাওম পালন করতে হবে। খালওয়া চলাকালে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় আকৃতিতে দেখা দিয়ে মুরিদকে বলেন, 'আমিই প্রভু' তাহলে ঐ মুরিদকে বলতে হবে, 'না, আপনি নিজে প্রভু নন, আপনি প্রভুতে নিহিত।' এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মুরিদ যদি তখনও শিক্ষানবিশীতে থাকেন তাহলে ঐ দেহাকৃতি মিলিয়া যাবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি সত্যিকারের দর্শন দান (তাজাল্লি)। ৪০ দিন পর ঐ মুরিদ ধীরে ধীরে তার পূর্ব খাদ্যাভ্যাসে ফিরে আসবেন।

আলজিরিয়ায় ফরাসি বিজয় অভিযানকালে কাদেরিগণ প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঐ সময় সেখানকার ক্বাদেরিয়া দলপতি মুহিউদ্দিনকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দানের প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তার পুত্র আবদুল কাদেরকে ঐ নেতৃত্ব গ্রহণের অনুমতি দেন। এই আবদুল কাদের রাজ ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তার তরিকার ধর্মীয় সংগঠনটিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। ফরাসিরা তার সার্বভৌমত্বের অনুমোদন দেয়। তার এই সার্বভৌমত্ব কখনো বিপন্ন হলে তিনি নতুন সেনা সংগ্রহের জন্য তরিকার মুকাদ্দাম পদে ফিরে যেতে পারতেন। তার পতন ও নির্বাসনের পর আফ্রিকার কাদেরিগণ ফরাসি সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে Aures নামক স্থানে স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্রোহ দেখা দিলে মেনাআর ক্বাদেরিয়া দলের শায়খ সি মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস প্রশংসনীয় আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এই তরিকাভূক্ত লোকেরাই ওয়ারগলা ও এলওয়াদ-এ ফরাসি সরকারকে সাহারা অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসে সহায়তা করে।

মূলতঃ ক্বাদেরিয়া তরিকা ও তার শাখ-প্রশাখা ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আরব, মরক্কো, মিসর, আলজেরিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

ক্বাদেরিয়া তরিকা বাংলাদেশ তথা পাক-ভারত উপমহাদেশে বহুল অনুসৃত ও অত্যন্ত সুপরিচিত তরিকা। এ তরিকার অনুসারী ভক্তবৃন্দ পাওয়া যাবে না এমন অঞ্চল এদেশে বিরল। তিনি প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। এরই নিদর্শন স্বরুপ তাঁর নামে বাংলাদেশের মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ এমনকি বাজারও গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে এই তরিকার ব্যাপক চর্চা শুরু হয় হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনি (র.) ও তাঁর সঙ্গী পির-দরবেশগণের দ্বারা। হযরত শাহ জালাল (র.) এদেশে ক্বাদেরিয়া তরিকা ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা বয়ে নিয়ে আসেন। সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার তেমন প্রসার না ঘটলেও ক্বাদেরিয়া তরিকার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। হযরত শাহ জালাল (র.), হযরত শাহ পরান (র.), হযরত ইয়াকুব শাহ (র.)-সহ ৩৬০ আউলিয়া ও তাঁর অনুসারী তথা ক্বাদেরিয়া তরিকার অনুসারীগন পরম্পরায় এ তরিকা পালন, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের পদচারণায় সিলেট পূণ্য ভূমিতে পরিণত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইসলামের মৌলিক আদর্শ প্রচারের জন্য সুদূর বাগদাদ হতে হযরত শাহ্ আলি বাগদাদি (র.) এ দেশে আসেন। তিনি ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর দরগাহ্ ঢাকার মিরপুরে রয়েছে।

ইসলামের দীপ শিখা দেদীপ্যমান করে রাজশাহীর মাটিতে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন আউলিয়াদের সর্দার গাউসুল আযম বড় পির মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর পৌত্র হযরত শাহ্ মখদুম (র.)। এছাড়াও রাজশাহীর প্রথম ইসলাম প্রচারক শহিদ হযরত

তুরকান শাহ্ (র.)। শায়িত আছেন খাজা ইসমাইল হোসেন চিশতি (র.), আবু জাহেদ কুদ্দুসি পাহাড়ী শাহ্ (র.), হযরত বোরহান উদ্দিন (র.), হযরত মতি শাহ্ (র.), হযরত শাহ্ অলি আহমেদ (র.), হযরত সৈয়দ মোকারম শাহ্ (র.), হযরত জাওয়াদুল হক (র.), হযরত শাহ্ সুলতান (র.), হযরত আলিকুলি বেগ (র.), হযরত করম আলি শাহ্ (র.)। আরো অনেক অলি-আউলিয়াগণ রাজশাহীর মাটিতে শায়িত আছেন।”[৫] যাদের সমহিম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের জন্য নির্মিত হয়েছে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের রাজপথ, ফলে আজ আমরা আল্লাহ - রাসূলের নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে যাচ্ছি, একথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই।

আমাদের নিকটকালে ফুরফুরা শরিফের পির মুজাদ্দেদে যামান, আমিরুশ্ শারিআত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আবু বকর সিদ্দিক (র.) অন্যান্য তরিকার পাশাপাশি কাদেরিয়া তরিকার সবক ও তালিম প্রদানে গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাঁর খলীফাগণও সেই নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান খলিফা দ্বারিয়াপুর শরিফের আলা হযরত পির কুতবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ সুফি আলহাজ্জ তোয়াজউদ্দিন আহমদ (র.) প্রাথমিক ভাবে মুরিদদেরকে ক্বাদেরিয়া তরিকার নিস্‌বত অনুযায়ী সাধারণত তালিম-তালকিন দিতেন। সুফি সদরুদ্দিন (র.), মাওলানা নিসারুদ্দিন আহমদ (র.), যশোরের মাওলানা আহমদ আলি এনায়েতপুরি (র.), খুলনার মাওলানা ময়েজুদ্দিন হামিদি (র.)-সহ অনেক পির ক্বাদেরিয়া তরিকার সবক দিতেন। যশোরের খড়কি শরিফের পির মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল করিম (র.) উনবিংশ শতাব্দীতে মূলতঃ নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সবক দিলেও ক্বাদেরিয়া তরিকারও সবক দিতেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় তাসাউফের উপর মৌলিক ও বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯ খ্রি.)। হযরত মাওলানা আবদুল করিম (র.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা শাহ্ আবু নঈম

(র.) ক্বাদেরিয়া তরিকার তালিম দিতেন। ক্বাদেরিয়া তরিকার উপর বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ খ্যাত মওরি খোলার হযরত কেবলা শাহ্ আহসান উল্লাহ (র.) তাঁর ১২৭ বছরের জীবনে ইসলাম প্রচারে এক অনবদ্য অবদান রাখেন, প্রথমে তিনি চিশতিয়া তরিকার তালকিন দিতেন, একদা তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন; মাওলানা রুশদির (র.) ভাষায়- 'স্বপ্নে হযরত বড়পির সাহেব হযরত কেবলাকে ক্বাদেরিয়া তরিকাতে লোকজনকে মুরিদ করতে আদেশ দেন। এই স্বপ্নের কথা হযরত কেবলা তাঁর পির সাহেবকে জানালে তিনি আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে ক্বাদেরিয়া ও চিশতিয়া উভয় তরিকাতে মুরিদ করাতে অনুমতি দেন।'[৬] এভাবে এ মহান পুরুষ, তাঁর বংশধরগণ ও আশেকিনবৃন্দ বংশ পরম্পরায় তরিকতের দীক্ষা ও দিশা দানের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করেছেন এবং এখনো তা আপন গতিতে অব্যাহত আছে। বর্তমানে তাঁর সুযোগ্য নাতি অলিয়ে আযম হযরত মাওলানা শাহ আহছানুজ্জামান শাহ সাহেব কেবলা গদ্দিনশিন আছেন এবং এ বলিষ্ঠ ধারাকে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বেগবান করে রেখেছেন।

বার আউলিয়ার শহর নামে খ্যাত চট্টগ্রাম জগতবিখ্যাত অলি-আবদাল, গাউস-কুতুবদের পদচারনায় ধন্য।

আল শেখ আল সাঈদ আফিফ উদ্দিন আল জিলানি, সুলতানুল আউলিয়া, কুতুবুল আকতাব, গাউসুল আযম শেখ সাইয়্যেদ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর উনিশতম বংশধর এবং সাইয়্যদুল মুরসালিন খাতামুন নাবিয়্যিন সাইয়্যেদানা হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর তেত্রিশতম বংশধর, ক্বাদেরিয়া তরিকার প্রবর্তক হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রা) একজন অত্যন্ত উঁচু মানের তাসাউফ বিজ্ঞানী। মুসলিম জাহান বিশেষত ইরাক ও মুসলিম

অধ্যুষিত দেশগুলোতে সুপ্রসিদ্ধ জিলানি পরিবার আহলে বায়তের প্রধান হিসেবে সুপরিচিত, যা নিকবাতুল আশরাফ নামে পরিচিত।

শেখ আফিফ উদ্দিন তাসাউফ, ফিক্হ এলমে শরিয়তের বিশেষ পণ্ডিত এবং বর্তমান যামানার ক্বাদেরিয়া তরিকা মাওলানা শেখ আব্দুল করিম মদাররিয়া কর্তৃক আল ইজাজা ও আল এলমিয়াহ বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন, যা একজন ইসলামি পণ্ডিত ব্যক্তির জন্য অতি উঁচুমানের বিশেষণ।

শেখ আফিফ উদ্দিন ১৯৭২ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সমাপনের পর হযরত আবদু কাদের জিলানি মসজিদসহ বাগদাদের বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইরাক ও বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আহ্বানে ওয়াজ-নসিহতের জন্য ভ্রমন করেন। পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া, ইরাক, সিঙ্গাপুর ও মালয়শিয়াসহ আরো অনেক দেশে তার অনেক মুরিদ ও শিষ্য রয়েছেন। এমনিভাবে হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর উনিশতম বংশধর শেখ আফি উদ্দিন-এর মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশে ক্বাদেরিয়া তরিকার চর্চা হচ্ছে এবং ক্রমাগত এ প্রসার লাভ করছে ও এর অবয়ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৌরিতানিয়ায় ক্বাদেরিয়া তরিকার অবস্থান অত্যন্ত সুবিশাল ও সুসংহত, যা দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানকার মেসোপটেমিয়ায় খোদ আবদুল কাদের জিলানি (র.) এ তরিকার বীজ বপন করেন। পরবর্তীতে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে আফ্রিকায় এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অন্যান্য ভ্রাতৃ সংঘের ন্যায় এ তরিকায়ও কিছু আধ্যাত্মিক আবেগ-প্রবণ বিষয়াবলীর সন্নিবেশ ঘটেছে। কিন্তু এগুলো তাদেরকে খোদা প্রাপ্তির সহায়ক শিক্ষায় অগ্রগামী করে। ক্বাদেরিয়া তরিকার সকল অনুসারীরা বিনয়ী হওয়ায় নৈতিক উপদেশ, উদারতা ও পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দতা ইত্যাদি গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণের শিক্ষা পেয়ে থাকেন।

মৌরিতানিয়ায় ক্বাদেরিয়া তরিকার দুটি প্রধান শাখার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তাহলো সিদিয়া (Sidia) এবং ফাদেলিয়া (Fadelia)। সিদিয়া শাখাটি Trarza এর নিকটে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল যা শেখ সিদিয়া বাবা কর্তৃক (Shaykh Sidia Baba) প্রবর্তিত হয় এবং ব্রাকন (Brakna), টাজান্ট (Tagant) ও আদরার (Adrar) নামক স্থানে গুরুত্ব সহকারে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অন্য দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোহাম্মদ ফাদেল কর্তৃক ওয়ালতা Oualata ও আটার (Atar) নামক স্থানে ফাদেলিয়া নামক ক্বাদেরিয়া তরিকার এ শাখাটির উন্মেষ ঘটে। এভাবে এতদাঞ্চলে এ তরিকার প্রশিক্ষন প্রচলন ও সম্প্রসারন অব্যাহত রয়েছে।

ক্বাদেরিয়া তরিকার কিছু নির্দিষ্ট বা খাস শিক্ষা বা তালিম রয়েছে। এ তরিকার নানাবিধ পালন-পদ্ধতির মাঝে রয়েছে ইসলামের মহান কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট তালিম। ক্বাদেরিয়া তরিকার অনুসারীগণের মতে, স্বয়ং মহানবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এই মহান কালেমার তালিম তরিকতের জ্যোতিষ্ক হযরত আলি (রা.) কে প্রদান করেন। তিনি এই তালিম বিশেষ পদ্ধতিতে সুফিকুল শিরোমণি হযরত হাসান বসরি (র.) কে শিক্ষা দেন। তাঁর সময়কাল থেকে বড়পির আব্দুল কাদের জিলানি (র.) এর সময় পর্যন্ত এই মহান কালেমার তালিম সিনায় সিনায় গুপ্তভাবে আসছিল। অতঃপর শায়খ জিলানি (র.) এই শিক্ষাকে আপামর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য সুশৃংখলিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করেন। আর তিনি তা গুপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদেরকে প্রদান করেন। এছাড়া বড়পির (র.) ক্বাদেরিয়া তরিকার অন্যান্য পালন-পদ্ধতিও সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করেন।

ক্বাদেরিয়া তরিকা মতে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর বার অক্ষরের মধ্যে এই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য লুকায়িত রয়েছে। আর এই বরকতপূর্ণ বারটি অক্ষরই হলো বিশ্বজগতের মূল কারণ ও উৎস। একত্ববাদের মূল রূপও হচ্ছে এই পবিত্র কালেমা। উল্লেখ্য যে, এই বার অক্ষরের

মধ্যে কোন নুকতা নেই। নুকতাশুন্য 'অক্ষরের সাহায্যে কালেমার সৃষ্টি কেন হলো, তা গভীর রহস্যময়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বস্তুত এই পবিত্র ও রহস্যাবৃত কালেমাকে জানলে, বুঝলে এবং গবেষণা সহকারে পড়লে জাগতিক সকল রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর যিনি এই কালেমার গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন, তিনিই লাভ করেন আরেফে রাব্বানি ও অলিয়ে কামেলের মর্যাদা। এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী সম্পর্কেই বলা হয়েছে- 'যে ব্যক্তি তাহকিক করে জীবনে একবার কালেমা পাঠ করবে, তার জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দেয়া হবে।'

'লা ইলাহা' বলে শ্বাস গ্রহণ এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলে শ্বাস ত্যাগ করাই হচ্ছে নফি-এসবাতের যিকির। একা একা জোরে (জলি) অথবা নিম্নস্বরে (খফি) এই তরিকাপন্থী সুফিগণ যিকির করে থাকেন। অনেক সময় কয়েকজন একসাথে বসেও সুফিগণ এই যিকির করে থাকেন। এভাবে তাঁরা যযবায়ে হালত ও খোদাপ্রাপ্তি লাভ করেন। ক্বাদেরিয়া তরিকার জুনায়েদিয়া শাখা 'সামা' বা ধর্মীয় সঙ্গীত শ্রবণের পক্ষপাতী। কেউ কেউ চিল্লাকুশীও করে থাকেন।[৭]

ক্বাদেরিয়া তরিকার পির-মুর্শেদগণ তাঁদের মুরিদদের মন-মানসিকতা ও অবস্থাভেদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর কিছু কিছু নির্ধারিত অযিফা (জপতপ) দিয়ে থাকেন। বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দুরুদ শরিফ পাঠ করারও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। মুরাকাবা-মুশাহেদায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পদ্ধতিও বাতলে দেন। বিশেষ নিয়মে নফি-এসবাতের যিকিরের প্রতি এই তরিকা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।[৮]

তথ্যসূত্র :

১. কাইয়ূম, হাসান আবদুল, *ইসলাম ও জীবন*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, এশিয়া পাবলিকেশনস - ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৫

২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ট খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৫০১

৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০২

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০৩

৫. রনী, মোঃ খায়রুল বাসার, প্রবন্ধঃ *রাজশাহীর প্রথম ইসলাম প্রচারক শহীদ হযরত তুরকান শাহ (রহ.)*, আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন ২০০৯ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরনিকা, পৃষ্ঠা-৪৩

৬. রুশ্‌দী, এ, এফ, এম, আবদুল মজীদ, *হযরত কেবলা*, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৬১

৭. রশীদ, ফকীর আবদুর, সূফী দর্শন, প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-১৭৬

৮. হাযারী, আবদুর রাহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৪২

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার মানে যদি এমন হয় যে কোন বিষয়ের উপর স্বার্থক আলোচনা করার পর তার যবনিকা টানা তাহলে অলিকুল শিরোমণি গাউসুল আযম মহিউদ্দিন হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্বাদেরিয়া তরিকা সম্পর্কে এমন ধারনা পোষন হবে নিতান্ত অমূলক, কেননা এর ব্যাপ্তি সুবিশাল ও তা সুগভীর রহস্যাবৃত। তার চেয়েও বড় কথা হলো এ সম্পর্কে বৃহদাকারের গ্রন্থ প্রনয়ন সম্ভব। আরো পাণ্ডিত্য অর্জনও সম্ভব যা বহির্মূখী জ্ঞানের আঁধার। মূলত তরিকার প্রকৃত অনুসারী হলো অন্তর্মুখী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তি। তাইতো বলা হয় যিনি যত বেশি নিভৃত, তিনি তত বেশি জাগ্রত।

তরিকা একটি সার্বজনীন ব্যবস্থার নাম যা নব উদ্ভাবিত কোন বিষয় নয়, সৃষ্টির আদি হতে আজো তা বহমান। একই দ্বিন হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার গতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষা করে আত্মপ্রকাশ করেছে, শরিয়ত বা সামাজিক আইনের রূপ ধারণ করে যেন মানুষ সহজে তার সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই সেই দ্বিনকে লাভ করতে পারে। এইরূপে দেখা যায় একই মূলনীতি বা ধর্মীয় ভিত্তি বিভিন্ন শরিয়তকে বহন করে মানুষের কার্যাদি পরিচালনা সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবিগণকে শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেন তাঁরা ঐ পরিবেশের উপযুক্ত করে এমন নিয়মাদি চালু করেন যেন প্রত্যেক সমাজ বা জাতি নিজ নিজ বৈশিষ্ঠের মধ্যে নিজেকে সুন্দর ও স্বার্থক করে তুলতে পারেন।[১]

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কেবল মাত্র দ্বীন ইসলামে প্রবেশের বিধান ও প্রস্তুতি মাত্র, মূলত আমরা এটাকেই মূল ধর্ম মনে করে প্রতিনিয়ত ভুল করছি এবং দ্বীন ইসলামের গভীর

তত্ত্ববোধ হতে প্রতিনিয়ত দূরে সরে পড়ছি বরং "আমরা যাকে দ্বীন ইসলাম বলে থাকি প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার ব্যবহারিক বিধান মাত্র, সমস্ত নবিগনের দ্বীন এক; এর বিধান ভিন্ন।[২]

অর্থাৎ ধর্মের শরিয়ত বিভিন্ন কিন্তু ধর্মের দর্শন অভিন্ন আর এ দর্শনকে মানব জীবনে ধারণ করার পদ্ধতি বা কর্মপন্থা হলো তরিকা।

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ), তিনি একাধারে নবি ও রাসুল সুতরাং দেখতে পাই মহান রাব্বুল আলামিন প্রথমত নবি ও রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে মানব জীবনের তরিকা বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর মানব জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন যা অতিশয় গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে এ ধরায় এক লক্ষ মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবি ও রাসুলের আগমন ঘটে, সবশেষে সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরনের মাধ্যমে নবুয়তের ধারাকে খতম করে দেন কিন্তু রেসালতের ধারা অব্যাহত থাকে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

এ অব্যাহত গতি ধারাই আমরা তরিকা হিসাবে প্রবাহমান দেখতে পাই। ক্বাদেরিয়া তরিকা হলো তার অন্যতম। হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের সমন্বয়ে এ অনন্য তাসাউফ বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইনসানে কামেল তথা পূর্ন মানব হবার কার্যকর দীক্ষা প্রদান করেন। তাঁর সমসাময়িক কাল হতে আজ পর্যন্ত মানুষ তার তরিকা অবলম্বন করে যিক্‌র-আয্‌কার, গভীর অনুধ্যান তথা মুরাকাবা-মুশাহাদার মাধ্যমে হাকিকত বা প্রকৃত দশায় উপনীত হয়ে অতি সহজে সত্যের দর্শন লাভে সিক্ত হয়েছেন।

এ মহান পুরুষের মতে, সাধারণ বিদ্যা অর্জনের জন্য যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন তেমনি এলমে তাসাউফ অর্জনের জন্য পির- মুর্শেদের অতীব প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, একজন ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষের নিকট বায়আত হয়ে তরিকত তথা তাসাউফ সাধনা

করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। কেননা শিক্ষা অর্জন যদি ফরয হয় তবে শিক্ষার উপকরণ তথা কিতাব সংগ্রহ করাও ফরয এবং এ কিতাব সংগ্রহের জন্য যদি বাজারে যেতে হয় তবে সেক্ষেত্রে বাজারে যাওয়াও ফরয। সুতরাং এলমে তাসাউফ শিক্ষা যেহেতু মুর্শেদ তথা ইনসানে কামেলের নিকটেই পাওয়া সম্ভব সেহেতু প্রত্যেক নর-নারীর জন্য মুর্শেদের অনুসারী হওয়া ফরয। এ বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য 'কেউ ফিক্হ (শরিয়ত) আমল করলো 'অথচ তাসাউফ বাদ দিলো সে ফাসিক আর তাসাউফ আমল করলো অথচ ফিক্হ বাদ দিলো সে যিন্দিক। আর যে দুটোই একত্রে আমল করলো সে মুহাক্কেক তথা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ।'

ইসলামে যেমন সুষ্ঠভাবে জীবন-বিধান পালনের জন্য বিভিন্ন মাযহাব রয়েছে তেমনি জীবন দর্শন-কে সুষ্ঠু পন্থায় জীবনে রূপায়িত করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন তরিকা এবং তরিকাগুলোর মধ্যে ক্বাদেরিয়া তরিকাকে প্রধান তরিকা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তার মূলে রয়েছে শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর অনবদ্য অবদান। বস্তুত তাঁর অসাধারণ বুযুর্গি আর নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি মানব হৃদয়ের বিশেষ স্থানটি অলংকৃত করে আছেন।

আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর খুতবাগুলো ও কবিতাবলী যেমন ভাষার দিক দিয়ে উন্নত ও সুমার্জিত, সেইরূপ সর্বজীবের প্রতি করুণায় ও মানবতার প্রতি প্রীতিরসে উচ্ছল ও ভরপুর। তিনি বলতেন, 'আমি মানুষের জন্য দোযখের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেহেশতের দরজা খুলে দেব।' মানবতার প্রতি মমত্ববোধের এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

তিনি দুনিয়াবি পদ-মর্যাদা ও খ্যাতি-যশের দিকে মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, 'তুমি বলো, আল্লাহ এক; কিন্তু তোমার অন্তরে যে বহু দেবতার স্থান রয়েছে- তোমার রাজা, তোমার মনিব, তোমার কাযি ও স্থানীয় কর্তাদের ভয়ে ও ভজনাতেই তো তোমার সারাদিন চলে যায়। যতক্ষণ না তুমি তোমার মন

থেকে এইসব ভয় দূর না করে দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমার ঈমান সম্পূর্ণ নয়, বলিষ্ঠ নয়: আর যে পর্যন্ত না তুমি দুনিয়াবি ধন-দৌলত ও শান-শওকতের আশা মন থেকে মুছে না ফেলছ, তোমার তাকওয়াও পূর্ণ নয়। দুনিয়ার আকর্ষণ ও খ্যাতি-সম্পদের প্রলোভনই আমাদেরকে ক্ষুদে কর্তাদের সম্মুখে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য করে, দৈনন্দিন শত-সহস্র হীনতা-দীনতার মধ্য দিয়ে এসব তুচ্ছ সামগ্রী আহরণ করতে প্রলুব্ধ করে। ফলে এক আল্লাহর ইবাদত ভুলে গিয়ে আমরা আমাদেরই সৃষ্ট সহস্র দেবতার অনুগ্রহ ভিখারী হই। এক আল্লাহর আসনে বহুকে স্থান দেই। সত্যিকার মুমেন-মুসলমানের পরিচয় তা নয়।

যারা শুধু রুটিন মাফিক আল্লাহর ইবাদতই করে চলে, কিন্তু ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করে না, তাদেরকেও সাবধান করে তিনি বলেছেন, 'নামায, রোযা, হজ্ব ও তোমার সব সৎকাজ তোমার পক্ষে অভিশাপ, যদি সেসবের মধ্য দিয়ে তুমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে না পার। তুমি অভ্যাসের বশেই আল্লাহর ইবাদত করে চলেছ, আবার এসবের বিনিময় তাঁর নিকটে বহুত কিছু প্রার্থনাও করছ। যারা সম্মানের ভিখারী, বেহেশত তাদের জন্য নয়, যারা সৎকাজের কারবার করে একমাত্র তাদের জন্যই বেহেশত। ঈমান কেবলমাত্র কথায় ও কাজে প্রতিপন্ন হয়। কাজ ছাড়া কথার দাম হয় না, আবার আন্তরিকতা না থাকলে কাজের স্বীকৃতিও মেলে না। কেবল পুণ্যের লোভে যে সৎকাজ করা হয় তা গ্রহণীয় হয় না–সৎকাজের দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তিনি সাম্যনীতির ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। একজন ভোগের প্রাচুর্যে হাবুডুবু খাবে, আরেকজন দারিদ্রের নিস্পেষণে জর্জরিত হবে, তাঁর নিকট এ বিধান কখনো ইসলামের নয়। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতেন, আফসোস যে, তোমার পুরোদিনের খাবার মজুদ আছে, আর তোমার নিকট প্রতিবেশী উপবাস থাকছে। তোমার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও, অন্যের জন্য তা না চাও। তোমার ঈমানে গলদ থেকে

যাবে যদি তোমার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য বেশি খাবার মজুদ থাকে, অথচ একজন অভাবগ্রস্ত তোমার দ্বার থেকে ফিরে যায় ।

তিনি ছিলেন উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসে সফলকাম পুরুষ। তিনি মূর্খ ও অলস অদৃষ্টবাদকে ধিক্কার দিয়ে সক্রিয় ও গতিশীল জীবনের পথে জানিয়েছেন, 'যারা অলস তারাই শুধু নসিবের দোহাই দিয়ে থাকে। নসিবের সঙ্গে আমাদের কী কারবার? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজের কোমর বেঁধে কর্মের পথে, কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া, বাকি ব্যবস্থা আল্লাহর।

এসব তত্ত্ববাণী সর্বযুগের সর্বমানবের উত্তরাধিকার। গাউসুল আযমের পাণ্ডিত্য ছিলো যেমন অসাধারণ, সেইরকম ভক্তিমার্গে জীবন দেবতার সব রহস্য উদঘাটন করে তিনি সত্য সুন্দরকে স্পষ্টরূপে মনোজগতে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, একান্ত হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। তাঁর সাধনায় মানবতা চরম উপকার লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চিশতী, সদর উদ্দিন আহমদ, মনস্তিদ দর্শন, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৮, ৫৯

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআন

২. আভারসাজী, আলী (সম্পাদিত), *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান,* ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৮

৩. ইসলাম, জেহাদুল, খান, সাইফুল ইসলাম, *দিওয়ান-ই-মুইনুদ্দিন,* খাজা মঞ্জিল, ৫৯২, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৩

৪. ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল, *হযরত গাউসুল আযমের অমরবাণী,* ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৭৮

৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৯

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ট খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৯

৭. ইসলাহী, সদরুদ্দীন, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, নবম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭

৮. *ঈমান ও ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগ, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩

৯. কাইয়ূম, হাসান আবদুল, *ইসলাম ও জীবন,* প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা

১০. খাঁ, ইব্রাহীম, আহসানউল্লাহ্, *ইসলাম সোপান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ১৯৯৫

১১. চিশতী, সদর উদ্দিন আহমদ, *মসজিদ দর্শন*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই, ২০০৫

১২. চৌধুরী, মোঃ রাশেদ, *বড় পির আবদুল কাদের জিলানি (র.)*, সাদনান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৭

১৩. ফজল, এম. শাহজাহান বিন, *বড় পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর জীবনী ও আশ্চর্য কেরামত*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০০

১৪. বাকিবিল্লাহ, সৈয়দ ছাজ্জাদ, *এলমে তাসাউফ অন্যতম ফরজে আইন*, প্রথম খণ্ড, গৌছিয়া তাসাউফ গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৭

১৫. *মুসলিম মনীষা*, পৃষ্ঠা-১৪৪

১৬. রহমান, নূরুর, *গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে, ২০০০

১৭. রনী, মোঃ খায়রুল বাসার, প্রবন্ধঃ *রাজশাহীর প্রথম ইসলাম প্রচারক শহীদ হযরত তুরকান শাহ (রহ.)*, আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন ২০০৯ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরনিকা

১৮. রশীদ, ফকীর আবদুর, *সূফী দর্শন*, প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৮০

১৯. রুশ্‌দী, এ, এফ, এম, আবদুল মজীদ, *হযরত কেবলা*, প্রথম প্রকাশ

২০. শাফী, মোহাম্মদ, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২

২১. সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৮৪

২২. হাযারী, আবদুর রহীম, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৮